ট্রান্সপারেন্সি
ইন্টারন্যাশনাল
বাংলাদেশ
দুর্নীতিবিরোধী সামাজিক আন্দোলন

বীরাঙ্গনা মুক্তিযোদ্ধাদের রাষ্ট্রীয় স্বীকৃতি ও অধিকারঃ সুশাসনের চ্যালেঞ্জ এবং উত্তরণের উপায়

রাবেয়া আক্তার কনিকা

১৬ জুন ২০২২

বীরাঙ্গনা মুক্তিযোদ্ধাদের রাষ্ট্রীয় স্বীকৃতি ও অধিকার: সুশাসনের চ্যালেঞ্জ এবং উত্তরণের উপায়

উপদেষ্টা
ড. ইফতেখারুজ্জামান
নির্বাহী পরিচালক, ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ

অধ্যাপক ড. সুমাইয়া খায়ের
উপদেষ্টা, নির্বাহী ব্যবস্থাপনা, ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ

মোহাম্মদ রফিকুল হাসান
পরিচালক, রিসার্চ অ্যান্ড পলিসি, ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ

গবেষণা তত্ত্বাবধান
শাহজাদা এম আকরাম, *সিনিয়র রিসার্চ ফেলো, গবেষণা ও পলিসি*

গবেষক
রাবেয়া আক্তার কনিকা, *রিসার্চ এসোসিয়েট-কোয়ালিটেটিভ*

প্রকাশ: ১৬ জুন ২০২২

যোগাযোগ
ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ
মাইডাস সেন্টার (পঞ্চম ও ষষ্ঠ তলা)
বাড়ি # ৫, সড়ক # ১৬ (নতুন), (পুরানো ২৭)
ধানমণ্ডি, ঢাকা ১২০৯
ফোন: +৮৮০ ২ ৪৮১১৩০৩২, ৪৮১১৩০৩৩ , ৪৮১১৩০৩৬
ফ্যাক্স: +৮৮০ ২ ৪৮১১৩১০১
ওয়েবসাইট: www.ti-bangladesh.org

সূচিপত্র

বীরাঙ্গনা মুক্তিযোদ্ধাদের রাষ্ট্রীয় স্বীকৃতি ও অধিকার: সুশাসনের চ্যালেঞ্জ এবং উত্তরণের উপায় ২

প্রথম অধ্যায়: ভূমিকা ২

গবেষণার প্রেক্ষাপট ও যৌক্তিকতা ২

গবেষণার প্রশ্ন ৪

গবেষণার উদ্দেশ্য ৫

গবেষণার পরিধি ৫

গবেষণা পদ্ধতি ৫

দ্বিতীয় অধ্যায়: বীরাঙ্গনাদের নিয়ে বিভিন্ন কার্যক্রম ৭

তৃতীয় অধ্যায়: বীরাঙ্গনাদের রাষ্ট্রীয় স্বীকৃতি ও অধিকার প্রাপ্তির প্রক্রিয়ায় চ্যালেঞ্জ ১২

১. আইনের শাসন ১২

১.১ দীর্ঘসূত্রতার চ্যালেঞ্জ: ১২

১.২ যাচাই-বাছাই প্রক্রিয়ার চ্যালেঞ্জ: ১৩

১.৩ আবাসন সুবিধা প্রাপ্তির ক্ষেত্রে চ্যালেঞ্জ: ১৪

২. সক্ষমতা ও কার্যকরতা ১৪

২.১ পরিকল্পনা ও উদ্যোগের ক্ষেত্রে ঘাটতি ১৪

২.২ জনবলের ঘাটতি ১৫

২.৩ হালনাগাদ ও নির্ভুল তথ্যের ঘাটতি ১৫

৩. অংশগ্রহণ ১৬

৩.১ বীরাঙ্গনাদের চিহ্নিত করা ১৬

৩.২ প্রত্যয়ন করার ক্ষেত্রে অসহযোগিতা ১৭

৩.৩ যোগাযোগের ক্ষেত্রে ঘাটতি ১৮

৪. অনিয়ম ও দুর্নীতি ১৮

৪.১ গেজেটভুক্তির প্রক্রিয়ায় অনিয়ম ও দুর্নীতি: ১৯

৪.২ বীর নিবাসের ঘর পাওয়ার ক্ষেত্রে অনিয়ম ও দুর্নীতির শিকার: ১৯

৪.৩ বীরাঙ্গনা নন এমন ব্যক্তিদের গেজেটভুক্ত হওয়া ১৯

৫. জবাবদিহিতা ২০

৫.১ অনিয়ম ও দুর্নীতি নিয়ন্ত্রণ ও তদারকি ব্যবস্থার ঘাটতি ২০

৬. সংবেদনশীলতা ২০

৬.১ সংশ্লিষ্ট অংশীজনের মধ্যে সংবেদনশীলতার ঘাটতি ২১

৬.২ স্বীকৃতি প্রাপ্তির প্রক্রিয়ায় সংবেদনশীলতার ঘাটতি ২১

৬.৩ স্বীকৃতি প্রাপ্তি ও সুযোগ-সুবিধার সমস্যা ২২

চতুর্থ অধ্যায়: উপসংহার ২৩

সার্বিক পর্যবেক্ষণ ২৩

গবেষণার সুপারিশ ২৩

সংযুক্তি ১: প্রেজেন্টেসনের শিরোনাম স্লাইডে ব্যবহৃত চিত্র প্রসঙ্গে ২৮

মুখবন্ধ

ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ (টিআইবি) দুর্নীতি প্রতিরোধ ও সুশাসন প্রতিষ্ঠায় সহায়ক পরিবেশ সৃষ্টির লক্ষ্যে কাজ করছে। এই লক্ষ্যকে সামনে রেখে টিআইবি জাতীয় ও স্থানীয় পর্যায়ে জনগুরুত্বপূর্ণ বিষয় নিয়ে গবেষণা ও অধিপরামর্শ কার্যক্রম পরিচালনা করে থাকে।

১৯৭১ সালে স্বাধীনতার পর মুক্তিযুদ্ধে নির্যাতনের শিকার হওয়া নারীদের তাদের আত্মত্যাগের সম্মানার্থে 'বীরাঙ্গনা' উপাধিতে ভূষিত করা হয়। ২০১৫ সালে নির্যাতিতা এই নারীদের 'নারী মুক্তিযোদ্ধা (বীরাঙ্গনা)' হিসেবে রাষ্ট্রীয় স্বীকৃতি ও অধিকার প্রদানের পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়। মুক্তিযুদ্ধের কয়েক দশক পরে হলেও মুক্তিযোদ্ধা হিসেবে বীরাঙ্গনাদের রাষ্ট্রীয় স্বীকৃতি ও সুযোগ-সুবিধা প্রদান সরকারের একটি অনন্য পদক্ষেপ। তবে শুরু থেকেই বীরাঙ্গনাদের রাষ্ট্রীয় স্বীকৃতি ও সুযোগ-সুবিধা প্রদানের প্রক্রিয়া নিয়ে রয়েছে নানা প্রশ্ন ও অভিযোগ। এছাড়াও গেজেটভুক্ত বীরাঙ্গনার সংখ্যা লক্ষণীয়ভাবে কম। এই পরিপ্রেক্ষিতে বীরাঙ্গনাদের রাষ্ট্রীয় স্বীকৃতি এবং অধিকার নিশ্চিতকরণের প্রক্রিয়া সুশাসনের নির্দেশকসমূহের আলোকে পর্যবেক্ষণ ও বিশ্লেষণ করার উদ্দেশ্যে টিআইবি এই গবেষণা কার্যক্রম পরিচালনা করেছে।

এই গবেষণায় দেখা যায়, বীরাঙ্গনাদের চিহ্নিত করা থেকে শুরু করে রাষ্ট্রীয় স্বীকৃতি ও সুযোগ-সুবিধা প্রদানের পুরো প্রক্রিয়ায় নানা ধরনের ঘাটতি বিদ্যমান। বীরাঙ্গনাদের রাষ্ট্রীয় স্বীকৃতি ও অধিকার প্রাপ্তির প্রক্রিয়া যেখানে সর্বোচ্চ গুরুত্বের সাথে বাস্তবায়ন করা আবশ্যক সেখানে পরিকল্পনাহীনতা, প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতার ঘাটতি, কাঠামোগত জটিলতা, অনিয়ম-দুর্নীতির সুযোগ, জবাবদিহি ব্যবস্থা ও সংবেদনশীলতায় ঘাটতি প্রক্রিয়াটিকে করে তুলেছে জটিল। তার সাথে সামাজিক সচেতনতা ও সংবেদনশীলতার ঘাটতিও লক্ষণীয়। একদিকে রাষ্ট্রীয় স্বীকৃতি ও অধিকার নিশ্চিতকরণে প্রাধান্যের ঘাটতি ও অন্যদিকে স্থানীয় পর্যায়ে সামাজিক-সাংস্কৃতিক নেতিবাচক মনোভাবের কারণে বীরাঙ্গনারা এখনো প্রান্তিকীকরণের শিকার। বীরাঙ্গনাদের রাষ্ট্রীয় স্বীকৃতি ও অধিকার প্রদানের এই প্রক্রিয়াটি গতানুগতিক অন্যান্য প্রক্রিয়া হতে ভিন্ন হওয়ার কথা থাকলেও পুরো প্রক্রিয়াটি গতানুগতিক আমলাতান্ত্রিক পদ্ধতিনির্ভর। সংবেদনশীল এই বিষয়টি বিশেষ বিবেচনায় না রাখার কারণে সম্পূর্ণ প্রক্রিয়াটি বীরাঙ্গনাদের জন্য অনেকক্ষেত্রেই জটিলতা, হয়রানি ও হতাশার সৃষ্টি করছে।

এই গবেষণায় অংশগ্রহণকারী বীরাঙ্গনা মুক্তিযোদ্ধা, বীরাঙ্গনা মুক্তিযোদ্ধাদের নিয়ে কাজ করছেন এমন বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের কর্মকর্তা, বীরাঙ্গনা মুক্তিযোদ্ধাদের নিয়ে কাজ করছেন এমন ব্যক্তি, মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয় ও জাতীয় মুক্তিযোদ্ধা কাউন্সিলের সংশ্লিষ্ট কমকর্তা, সংশ্লিষ্ট প্রশাসনিক কর্মকর্তা যারা তাঁদের মূল্যবান মতামত, অভিজ্ঞতা ও বিভিন্ন বিষয়ে পর্যবেক্ষণ তুলে ধরে এই গবেষণা প্রতিবেদনকে তথ্যসমৃদ্ধ করতে সহায়তা করেছেন তাঁদের সকলের প্রতি আন্তরিক ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি।

এই গবেষণা সম্পন্ন করেছেন টিআইবি'র গবেষক রাবেয়া আক্তার কনিকা। টিআইবি'র উপদেষ্টা, নির্বাহী ব্যবস্থাপনা, অধ্যাপক ড. সুমাইয়া খায়ের, এবং গবেষণা ও পলিসি বিভাগের পরিচালক মোহাম্মদ রফিকুল হাসান এই গবেষণা কার্যক্রমের উপদেষ্টা হিসেবে দায়িত্ব পালন করেছেন। গবেষণার তত্ত্বাবধান এবং প্রতিবেদন সম্পাদনা ও পরিমার্জন করেছেন সিনিয়র রিসার্চ ফেলো শাহজাদা এম আকরাম। এছাড়া মাঠ পর্যায় থেকে তথ্য সংগ্রহ এবং খসড়া প্রতিবেদনের ওপর গুরুত্বপূর্ণ মতামত প্রদানের জন্য অন্যান্য সহকর্মীর প্রতি কৃতজ্ঞতা জানাই।

এই গবেষণার ফলাফল ও সুপারিশের আলোকে সংশ্লিষ্ট নীতি-নির্ধারকগণ বীরাঙ্গনাদের রাষ্ট্রীয় স্বীকৃতি এবং অধিকার নিশ্চিতকরণের প্রক্রিয়ায় সুশাসন প্রতিষ্ঠা করতে কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ করলে আমাদের প্রচেষ্টা সার্থক হবে। গবেষণা প্রতিবেদন সম্পর্কে পাঠকের পরামর্শ সাদরে গৃহীত হবে।

ইফতেখারুজ্জামান
নির্বাহী পরিচালক

প্রথম অধ্যায়: ভূমিকা

গবেষণার প্রেক্ষাপট ও যৌক্তিকতা

মুক্তিযুদ্ধ বাংলাদেশের ইতিহাসের একটি গৌরবোজ্জ্বল অধ্যায়। দেশকে স্বাধীন করার জন্য এবং স্বাধীনতার অনুভূতিকে স্পর্শ করার জন্য এই দেশকে এবং দেশের মানুষকে চরম পরিস্থিতির মধ্য দিয়ে যেতে হয়েছে। গুটিকতক আলবদর-রাজাকার-শান্তি কমিটির সদস্য ছাড়া জাতি, বর্ণ, লিঙ্গ, পেশা, বয়স নির্বিশেষে স্বাধীনতাকামী সমগ্র জনগোষ্ঠীই মুক্তিযুদ্ধের সঙ্গে একাত্ম ছিলেন।[১] তবে স্বাধীনতার সূচনালগ্ন হতেই মূলত তারাই মুক্তিযোদ্ধা হিসেবে জনগণের কাছে সম্মানিত এবং রাষ্ট্রীয়ভাবে স্বীকৃত হয়েছেন যারা অস্ত্র হাতে যুদ্ধ করেছেন, যুদ্ধ সংঘটিত করেছেন, এবং প্রশাসনিক ও কূটনৈতিক ক্ষেত্রে অবদান রেখেছেন।[২] এর একটি কারণ হতে পারে সাধারণত শারীরিক লড়াই এবং বন্দুকযুদ্ধ দ্বারাই কেবলমাত্র যুদ্ধকে বিবেচনা করা হয়ে থাকে। তবে বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের ক্ষেত্রে যেখানে দেশের সমগ্র জনগোষ্ঠী ঐক্যবদ্ধ হয়ে স্বাধীনতা জন্য লড়েছে সেক্ষেত্রে যুদ্ধ শুধু রণাঙ্গনেই হয় নি এবং অস্ত্র দিয়েই হয় নি।[৩] মুক্তিযুদ্ধের সময় বাংলাদেশের মোট জনসংখ্যা ছিল ৬৫,৫৩২,৬৩৫ জন। নারী ছিল মোট জনসংখ্যার ৪৮.৩১%।[৪] সে হিসেবে মুক্তিযুদ্ধকালীন সময়ে এদেশে মোট নারী ছিল ৩১,৬৫৭,০২২ জন, যাঁদের একটা বড় অংশ কোনো না কোনোভাবে যুদ্ধের সঙ্গে সম্পৃক্ত ছিলেন। কিন্তু মুক্তিযুদ্ধে নারীর অংশগ্রহণ ও ভূমিকা সেভাবে কখনোই দৃশ্যমান হয়ে ওঠেনি। একটা দেশের স্বাধীনতার পেছনে নানাভাবে বিভিন্ন মানুষের নানামুখী অবদান থাকে। অথচ মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক আলোচনায় বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই নারীর ভূমিকা গৌণ থেকে যায়।[৫]

১৯৭১ সালের মুক্তিযুদ্ধ প্রকৃত অর্থেই ছিল জনযুদ্ধ। নারী-পুরুষ নির্বিশেষে সকলেই সর্বাত্মকভাবে এই যুদ্ধে শামিল হয়েছিল। পাকিস্তানি বাহিনীর গুলিতে নিহত হয়েছে নারী, পুরুষ, শিশুসহ লাখো মানুষ। বাছবিচারহীনভাবে নিপীড়ন, ধর্ষণ, লাঞ্ছনা ও সহিংসতার ঘটনা ঘটেছে অসংখ্য নারীর বিরুদ্ধে।[৬] যুদ্ধে নারীর অংশগ্রহণ প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ দু'রকমভাবেই ছিল। কখনো সহযোদ্ধা হিসেবে, কখনো সরাসরি। এ ছাড়া অস্ত্রচালনা ও গেরিলা যুদ্ধের প্রশিক্ষণ, আহত মুক্তিযোদ্ধাদের সেবাশুশ্রুষা, তথ্য সরবরাহ, মুক্তিযোদ্ধাদের জন্য খাদ্য, অর্থ, বস্ত্র ও ওষুধপত্র সংগ্রহ করে তাদের কাছে পৌঁছে দিয়েও যুদ্ধে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছেন নারীরা। কিন্তু মুক্তিযুদ্ধে নারীর অবদান সেভাবে মূল্যায়িত হয় নি। বর্তমানে দেশে গেজেটভুক্ত মুক্তিযোদ্ধার সংখ্যা ২ লক্ষাধিক হলেও তার মধ্যে নারী মুক্তিযোদ্ধার সংখ্যা কেবলমাত্র ২৭৩/২০৬ জন।[৭] মুক্তিযুদ্ধে বিশেষ অবদানের জন্য খেতাবপ্রাপ্ত মোট ৬৭৬ জন মুক্তিযোদ্ধার মধ্যে নারী কেবলমাত্র তিনজন।[৮] তাঁদের মধ্যে ১৯৭২ সালে ক্যাপ্টেন সিতারা বেগম, এরপর তারামন বিবি ১৯৭৩ সালে ও ১৯৯৭ সালে কাঁকন বিবি বীর প্রতীক খেতাবে ভূষিত হন।[৯]

যুদ্ধে বর্বরতা ও নৃশংসতার শিকার সবচেয়ে বেশি হয়ে থাকে নারী ও শিশুরা। বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের সময়ও তার ব্যতিক্রম ঘটে নি।[১০] ১৯৭১ সালে পাকিস্তানি সেনাবাহিনী তাদের দোসর রাজাকার ও দালালদের প্রত্যক্ষ সহায়তায় বাংলাদেশের নারীদের ধর্ষণ ও নির্যাতন করেছিল। ধর্ষণ, গণধর্ষণ ও হত্যার শিকার হয়েছিল সাত থেকে পঁচাত্তর বছর বয়সী নারী ও মেয়েরা।[১১] নৃশংসতার এ ধরনের ঘটনা বিশ্ব ইতিহাসে খুব কমই ঘটেছে। ছয় বছরব্যাপী দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে গোটা ইউরোপে নাৎসি ও ফ্যাসিস্ট বাহিনী সম্মিলিতভাবে এত বেশি নারীকে ধর্ষণ ও নির্যাতন করেনি।[১২] শত্রুকে লাঞ্ছিত করা এবং তাদের চেতনাকে ভেঙ্গে ফেলার মাধ্যম হিসেবে ধর্ষণের সাধারণ কৌশল নারীকে যুদ্ধের অস্ত্রে পরিণত করে।[১৩] পাকিস্তানি সেনাবাহিনী এই কৌশলই গ্রহণ করেছিল। এই

---

[১] Bhuiyan MS, Dipu TA. 'The Participation of women in the Liberation War of Bangladesh in 1971: A Historical Analysis', American Journal of Humanities and Social Sciences Research (AJHSSR), 2020, Volume-4, Issue-8, pp-215-224.

[২] *সমকাল*, 'মুক্তিযুদ্ধে অবদান ও স্বীকৃতি', ৩০ জানুয়ারি ২০১৪; samakal.com/todays-print-edition/tp-editorial-comments/article/140136137/ (২৮ জানুয়ারি ২০২২)।

[৩] *প্রাগুক্ত*।

[৪] বিশ্ব ব্যাংক, ডাটা ব্যাংক, data.worldbank.org/indicator/SP.POP.TOTL?locations=BD31 (জানুয়ারি ২০২২)।

[৫] *দৈনিক আমাদের সময়*, 'মুক্তিযুদ্ধে বীরাঙ্গনাদের অবদান ও স্বীকৃতি', ১৫ ডিসেম্বর ২০১৯; www.dainikamadershomoy.com/post/231819 (২৮ জানুয়ারি ২০২২)।

[৬] *প্রথম আলো*, 'মুক্তিযুদ্ধে নারী, নারীর মুক্তিযুদ্ধ', ১৬ ডিসেম্বর ২০১৮; www.prothomalo.com/special-supplement/victoryday/ (২৫ জানুয়ারি ২০২২)।

[৭] *বণিক বার্তা*, '৬৫৪ নারী মুক্তিযোদ্ধা পেলেন রাষ্ট্রীয় সম্মাননা', ১৫ ফেব্রুয়ারি ২০২২, bonikbarta.net/home/news_description/290172/৬৫৪ (২১ মার্চ ২০২২)।

[৮] *প্রাগুক্ত*।

[৯] *প্রথম আলো*, 'মুক্তিযুদ্ধে নারী, নারীর মুক্তিযুদ্ধ', *প্রাগুক্ত*।

[১০] Islam KS. 'Breaking down the Birangona: examining the (divided) media discourse on the war heroines of Bangladesh's independence movement'. *International Journal of Communication*. 2012 Aug 30; 6:18.

[১১] Sharlach, L. (2000). 'Rape as genocide: Bangladesh, the former Yugoslavia, and Rwanda'. *New Political Science*, 22(1), 89-102.

[১২] বীরাঙ্গনা ও যুদ্ধশিশু, ১৫ জুন ২০১৬; mstjebunnahar.wordpress.com/2016/06/16/ (১২ জানুয়ারি ২০২২)।

[১৩] Sajjad T. 'The post-genocidal period and its impact on women. Plight and fate of women during and following genocide'. 2017, Jul 5:219-49.

নির্যাতন ছিল সুপরিকল্পিত, তারা বাঙ্গালীদের ধর্ষণের মাধ্যমে এক নতুন জাতির সৃষ্টি করতে চেয়েছিল যাতে বাঙ্গালী জাতীয়তাবাদ আর কোনোদিন মাথা তুলে না দাঁড়াতে পারে।[১৪] প্রেসিডেন্ট হিসেবে ইয়াহিয়া খান ১৯৭১ সালে সরাসরি বাঙালিদের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ার জন্য পাকিস্তান সেনাবাহিনীকে নির্দেশ দিয়েছিলেন, এবং 'আগে এদেরকে মুসলমান বানাও' এই নির্দেশনা দানের মধ্য দিয়ে বাঙালি মেয়েদেরকে জোরপূর্বক ধর্ষণ করে তাদেরকে দিয়ে "প্রকৃত" মুসলমান বাচ্চা জন্ম দেওয়ার রাস্তা দেখিয়ে দেন। পাকিস্তানি সৈন্য এবং তাদের এদেশীয় দোসররা এদেশের মেয়েদেরকে শুধু যত্রতত্র ধর্ষণ করেই ক্ষান্ত হয়নি, বরং জোর করে তাদেরকে ক্যাম্পে তুলে নিয়ে গিয়ে দিনের পর দিন আটকে রেখে তাদের উপর অবর্ণনীয় নির্যাতন চালিয়েছে।[১৫]

মুক্তিযুদ্ধের সময় সারাদেশে কত নারী ধর্ষিত বা নির্যাতিত হয়েছিল তার কোনো সঠিক হিসাব নেই। সরকারি হিসাব মতে, ২ লক্ষ নারী নির্যাতনের শিকার হয়েছিলেন মুক্তিযুদ্ধের সময়। যুদ্ধকালীন সময়ে সারা দেশের ৪৮০টি থানা থেকে গড়ে প্রতিদিন ২ জন করে নির্যাতিত মহিলার সংখ্যা অনুসারে ২৭০ দিনে ধর্ষিতার নারীদের সংখ্যা ২ লক্ষ ধরা হয়।[১৬] তবে সেই সময়ের বিভিন্ন গবেষণা প্রতিবেদন অনুযায়ী এ সংখ্যা ১০ লাখের মতো। ইতিহাসবিদ ড. মুনতাসীর মামুন তার 'বীরাঙ্গনা-১৯৭১' শীর্ষক গবেষণায় দেখিয়েছেন যে এ সংখ্যা আনুমানিক ৬ লাখের কাছাকাছি। আরেকটি সংখ্যার ধারণা পাওয়া যায় অস্ট্রেলিয়ান ডা. জিওফ্রে ডেভিসের থেকে যিনি যুদ্ধকালীন নির্যাতিত নারীদের সেবাদানের জন্যই বাংলাদেশে এসেছিলেন। দৈনিক বাংলার বাণী পত্রিকায় ১৯৭২ সালে প্রকাশিত একটি প্রতিবেদনে তিনি বলেন, "মুক্তিযুদ্ধে নির্যাতিতা নারীর সংখ্যা চার লাখের কম নয়। অন্তঃসত্ত্বা মহিলার সংখ্যাই ২ লাখ। অন্তঃসত্ত্বা মহিলাদের সাহায্য সংক্রান্ত কর্মসূচি শুরু হবার আগেই দেড় লাখ থেকে ১ লাখ ৭০ হাজার মহিলা গর্ভপাত করেছেন। অবশিষ্ট ৩০ হাজারের মধ্যে কেউ কেউ আত্মহত্যা করেছেন, কেউ কেউ তার শিশুদের নিজের কাছে রাখার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন।"[১৭]

স্বাধীনতা অর্জনের পরপরই ১৯৭১ সালের ২২ ডিসেম্বর সদ্য স্বাধীন রাষ্ট্র বাংলাদেশ সরকারের পক্ষ হতে মুক্তিযুদ্ধে নির্যাতনের শিকার হওয়া নারীদেরকে তাদের আত্মত্যাগের সম্মানার্থে "বীরাঙ্গনা" উপাধি প্রদান করা হয়।[১৮] পরবর্তীতে ১৯৭২ সালের ২৬ ফেব্রুয়ারি বন্যা প্রতিরোধক বাঁধ নির্মাণ কাজের উদ্বোধন করতে বঙ্গবন্ধু পাবনার বেড়া উপজেলার বসন্তপুর গ্রামে গেলে উক্ত অনুষ্ঠানে কয়েকজন নারী বঙ্গবন্ধুর সঙ্গে দেখা করে মুক্তিযুদ্ধের সময়ে পাকিস্তানি হানাদার বাহিনীর হাতে তাদের নির্যাতিত হওয়ার ঘটনার বিস্তারিত জানান। তাদের কথা শুনে তাদের পুনর্বাসনের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের আদেশ দেন বঙ্গবন্ধু। পরে উদ্বোধনী অনুষ্ঠানের বক্তৃতায় বঙ্গবন্ধু বলেন, "আজ থেকে পাকিস্তানি হানাদার বাহিনীর দ্বারা নির্যাতিতা মহিলারা সাধারণ মহিলা নয়, তারা এখন থেকে 'বীরাঙ্গনা' খেতাবে ভূষিত। কেননা দেশের জন্যই তারা ইজ্জত দিয়েছেন। মুক্তিযোদ্ধাদের চেয়ে তাদের অবদান কম নয় বরং কয়েক ধাপ উপরে, যা আপনারা সবাই জানেন, বুঝিয়ে বলতে হবে না। তাই তাদের বীরাঙ্গনার মর্যাদা দিতে হবে এবং যথারীতি সম্মান দেখাতে হবে। আর সেই সব স্বামী বা পিতাদের উদ্দেশ্যে আমি বলছি, আপনারাও ধন্য। কেননা এ ধরনের ত্যাগী ও মহৎ স্ত্রীর স্বামী বা পিতা হয়েছেন। তোমরা বীরাঙ্গনা, তোমরা আমাদের মা।" এরপর প্রথম পঞ্চবার্ষিক (১৯৭৩-১৯৭৮) পরিকল্পনাতেও স্বাধীনতাযুদ্ধে ক্ষতিগ্রস্ত নারীদের শিক্ষা, স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা, সমাজকল্যাণ বিভিন্ন কর্মসূচি গৃহীত হয়।[১৯]

১৯৭২ সালের ১ ফেব্রুয়ারি নির্যাতিত নারীদের জন্য মহিলা পুনর্বাসন কেন্দ্র প্রতিষ্ঠা করা হয়। গঠন করা হয় নারী পুনর্বাসন বোর্ড। এই বোর্ডের মাধ্যমে মুক্তিযুদ্ধে নির্যাতিত নারী ও শিশুর তথ্য সংগ্রহ, তাদের পুনর্বাসনের ব্যবস্থা করা, নারীদের বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণ দেওয়া, বীরাঙ্গনা নারীসহ যেসব পরিবারের উপার্জনক্ষম পুরুষ মুক্তিযুদ্ধে শহীদ হয়েছেন এমন পরিবারের নারীদের চাকরি ও প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা হয়। ঢাকার বেইলি রোডে চালু করা হয় সেক্রেটারিয়াল কোর্স, মোহাম্মদপুরে সেলাই ও কারুশিল্প প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা হয়, সাভারে খোলা হয় পোলট্রি ফার্ম- এভাবে সারাদেশ বীরাঙ্গনাদের পুর্নবাসনের জন্য প্রশিক্ষণ কেন্দ্র ও আবাসন সুবিধা সৃষ্টি করা হয়। সরকারি উদ্যোগকে বেগবান করতে বেসরকারি ও নাগরিক উদ্যোগও যোগ হয় – কারিতাস, কারিকা, নিরাশ্রয় মহিলা পুনর্বাসন সমিতি – এসব বেসরকারি সংস্থা এগিয়ে আসে। বঙ্গবন্ধু ১৯৭২ সালে সরকারি, আধাসরকারি, স্বায়ত্তশাসিত ও আধাস্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠানে কমপক্ষে শতকরা ১০% পদে নির্যাতিত মহিলা অথবা মুক্তিযুদ্ধে যাদের আত্মীয়স্বজন মারা গেছেন, এমন সব মহিলার জন্য সংরক্ষিত রাখার আদেশ দেন। নারী পুনর্বাসন বোর্ডের দায়িত্ব ও কার্যপরিধি বেড়ে যাওয়ায় ১৯৭৪ সালে বঙ্গবন্ধু সরকার 'নারী পুনর্বাসন ও কল্যাণ ফাউন্ডেশন'-এ উন্নীত করেন।[২০]

---

[১৪] বীরাঙ্গনা ও যুদ্ধ শিশু এবং এক অসহায় অনুচ্চারিত ইতিহাস, ১৫ মার্চ ২০১৩; m.somewhereinblog.net/mobile/blog/s_rezowana/29797917 (২২ জানুয়ারি ২০২২)।

[১৫] আহমেদ, 'আমাদের বীরাঙ্গনা নারী এবং যুদ্ধ শিশুরা: পাপমোচনের সময় এখনই', ২৬ জানুয়ারি ২০০৯, blog.muktomona.com/2009/01/26/721/#comments (২২ জানুয়ারি ২০২২)।

[১৬] *সারা বাংলা*, 'মুক্তিযুদ্ধে নারী নির্যাতন কড়চা', sarabangla.net/post/sb-659215/ (২ এপ্রিল, ২০২২)।

[১৭] পাকিস্তানি সেনাদের ধর্ষণ ও নির্যাতনের বহুমাত্রিক দিক- ইতিহাসের কৃষ্ণ অধ্যায়, songramernotebook.com/archives/45073 (২২ জানুয়ারি ২০২২)।

[১৮] Mookherjee N. HISTORY AND THE BIRANGONA. The ethics of representing narratives of sexual violence of the 1971 Bangladesh war, 2017.

[১৯] বীরাঙ্গনা ও যুদ্ধ শিশুদের পুনর্বাসনে বঙ্গবন্ধু, ২১ মার্চ, ২০২০।

[২০] *প্রাগুক্ত*।

১৯৭৫ সালের ১৫ আগস্ট বঙ্গবন্ধুকে সপরিবারে হত্যার পর নির্যাতিত নারীদের পুনর্বাসন বিষয়ক সকল কর্মসূচি বন্ধ হয়ে যায়। আশ্রয়কেন্দ্রে আশ্রয় নেওয়া অসহায় বীরাঙ্গনা নারীরা নানা স্থানে ছড়িয়ে ছিটিয়ে পড়েন। তাছাড়া সমগ্র দেশে ছড়িয়ে-ছিটিয়ে থাকা বীরঙ্গনাদের কোনো তালিকা প্রণয়ন করা হয়নি। এমনকি যারা পুনর্বাসন কেন্দ্রে আশ্রয় নিয়েছিলেন, তাদের নাম-ধাম-পরিচয়ও সংরক্ষণ করা হয়নি। স্বাধীনতা উত্তর বাংলাদেশে যুদ্ধের সময় নির্যাতিত নারীদেরকে সম্মানিত করার জন্য উপাধিতে ভূষিত করা হলেও সামাজিক প্রেক্ষাপট বিবেচনা করে তাদের কোনো তালিকা প্রণয়ন করা হয় নি।

বঙ্গবন্ধুর ঘোষণার পর থেকে বীরাঙ্গনা শীর্ষক সম্মানসূচক উপাধি প্রবর্তনের রাষ্ট্রীয় উদ্যোগ নেওয়া হয়। কিন্তু লোকলজ্জা ও মানসম্মানের ভয়ে পাকহানাদার বাহিনী কর্তৃক নির্যাতিত অনেক নারী ও তাদের পরিবারের সদস্যরা এই ঘটনাটি গোপন রেখেছে। এমনকি অনেকেই তখন বীরাঙ্গনা উপাধিটিও গ্রহণ করতে চান নি কলঙ্কিত হওয়ার ভয়ে। যারা নিজেদের বীরাঙ্গনা পরিচয় প্রকাশ করেছিল তাদের একটা অংশ সমাজের কিছু সদস্যের সহানুভূতি অর্জন করলেও অধিকাংশই হয়েছিল ক্ষতিগ্রস্ত। যাদের পরিচয় প্রকাশ পেয়েছিল তাদের বেশিরভাগই পরিবার ও সমাজ থেকে বর্জিত হয়েছিল। অবিবাহিত মহিলাদের ক্ষেত্রে পিতামাতা এবং বিবাহিত মহিলাদের ক্ষেত্রে স্বামী এবং শ্বশুরবাড়ির লোকজন তাদেরকে প্রত্যাখ্যান করেছিল। এমনকি 'বীরাঙ্গনা' শব্দটিকে বিকৃত করে এটিকে 'বারাঙ্গনা (পতিতা)' উচ্চারণ করেও ব্যবহার করা হতো।[২১]

বীরাঙ্গনাদের নিয়ে সামাজিক সাংস্কৃতিক প্রেক্ষাপটে এক ধরনের নেতিবাচক মনোভাব বিরাজমান। পরিবার, সমাজ কেউই তাদের আত্মত্যাগকে সম্মানের চোখে দেখে নি। মূলধারার উপস্থাপনাতেও বীরাঙ্গনাদেরকে মূলত উপস্থাপন করা হয়েছে শুধুমাত্র নির্যাতিত হিসেবে। তাদের অবদান বরাবরই সমাজের সম্মানের প্রশ্নে এসে আড়াল থেকে গেছে। মুক্তিযুদ্ধে অবদান রাখার জন্য যাদের সামাজিক ও রাষ্ট্রীয়ভাবে সম্মানিত ও সুবিধাপ্রাপ্ত হওয়ার কথা তার পরিবর্তে তাদেরকে পরিচয় গোপন করে মানবেতর জীবনযাপন করতে বাধ্য হতে হয়েছে। স্বাধীনতার ৪০ বছর পরও রাষ্ট্র বীরাঙ্গনাদের নিয়ে মৌণতা হতে বের হতে পারে নি।

নারীদের অধিকার নিয়ে কাজ করে এমন বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান ও ব্যক্তি বীরাঙ্গনাদের অধিকার ও স্বীকৃতির বিষয়টি নিশ্চিত করার জন্য সামনে এগিয়ে আসে। এই সূত্র ধরে বাংলাদেশ জাতীয় মহিলা আইনজীবী অ্যাসোসিয়েশনের পক্ষ থেকে উচ্চ আদালতে বীরাঙ্গনাদের মর্যাদা বৃদ্ধি করার জন্য একটি পিটিশন পেশ করা হয়। ২০১৪ সালের ২৭ জানুয়ারি উচ্চ আদালত বীরাঙ্গনাদের মর্যাদাকে কেন বর্ধিত করা হবে না এ ব্যাপারে সরকারের কাছে জানতে চায়। পরে ২৯ জানুয়ারি ২০১৫ সালে জাতীয় সংসদ বীরাঙ্গনাদের মুক্তিযোদ্ধার মর্যাদা দেওয়ার প্রস্তাব পাশ করে যেখানে পাকিস্তানি হানাদার বাহিনী ও তাদের সহযোগী কর্তৃক নির্যাতিতা নারীদেরকে "নারী মুক্তিযোদ্ধা (বীরাঙ্গনা)"[২২] হিসেবে গেজেটভুক্ত করা এবং মাসিক ভাতাসহ মুক্তিযোদ্ধাদের জন্য প্রযোজ্য সকল সরকারি সুবিধা প্রদান ও আর্কাইভ তৈরি করার বিষয়ে বলা হয়।[২৩] এরই ধারাবাহিকতায় ২০১৫ সালের ১৬ সেপ্টেম্বর জারিকৃত প্রজ্ঞাপন অনুযায়ী মুক্তিযুদ্ধবিষয়ক মন্ত্রণালয় ৪১ জন বীরাঙ্গনাকে মুক্তিযোদ্ধার স্বীকৃতি দিয়ে গেজেট প্রকাশ করে।[২৪] পরবর্তীতে ধাপে ধাপে ২৪ মে ২০২২ পর্যন্ত গেজেটভুক্ত মোট বীরাঙ্গনা মুক্তিযোদ্ধার সংখ্যা ৪৪৮ জনে উপনীত হয়েছে, এবং প্রক্রিয়াটি চলমান।[২৫]

বীরাঙ্গনাদেরকে তাদের প্রাপ্ত সম্মান ও অধিকার দিতে চার দশকেরও বেশি সময় অতিক্রান্ত হয়ে গেছে। মুক্তিযোদ্ধা হিসেবে গেজেটভুক্তির প্রজ্ঞাপন জারির ছয় বছরেরও বেশি সময় অতিক্রান্ত হয়ে গেলেও গেজেটভুক্ত বীরাঙ্গনার সংখ্যা লক্ষণীয়ভাবে কম। সরকারের স্বীকৃত সংখ্যার হিসাবেই বীরাঙ্গনাদের সংখ্যা ২ লক্ষ, সেখানে এখন পর্যন্ত গেজেটভুক্ত বীরাঙ্গনার সংখ্যা প্রায় সাড়ে চারশত। এছাড়াও বীরাঙ্গনাদের স্বীকৃতি ও সুবিধা প্রাপ্তির প্রক্রিয়া নিয়েও রয়েছে নানা প্রশ্ন ও অভিযোগ। এই পরিপ্রেক্ষিতে বীরাঙ্গনাদের রাষ্ট্রীয় স্বীকৃতি এবং অধিকার নিশ্চিতকরণের প্রক্রিয়া সুশাসনের নির্দেশকসমূহের আলোকে পর্যবেক্ষণ ও বিশ্লেষণ করার উদ্দেশ্যে এই গবেষণাটি পরিচালনা করা হয়েছে।

গবেষণার প্রশ্ন

বীরাঙ্গনাদের রাষ্ট্রীয় স্বীকৃতি এবং অধিকার নিশ্চিতকরণের প্রক্রিয়া সুশাসনের নির্দেশকসমূহের আলোকে পর্যবেক্ষণ ও বিশ্লেষণ করার জন্য নিম্নোক্ত প্রশ্নগুলো এই গবেষণায় বিবেচনায় নেওয়া হয়েছে-

- মুক্তিযোদ্ধা হিসেবে রাষ্ট্রীয় স্বীকৃতি ও সহায়তা প্রাপ্তি প্রক্রিয়া বীরাঙ্গনাদের জন্য কতটা সহায়ক? এক্ষেত্রে তাদেরকে কী ধরনের অভিজ্ঞতার সম্মুখীন হতে হয়?
- রাষ্ট্রীয় স্বীকৃতি ও সহায়তা প্রাপ্তি প্রক্রিয়ায় বীরাঙ্গনাদের কোনো ধরনের চ্যালেঞ্জ ও দুর্নীতির সম্মুখীন হতে হলে তা থেকে উত্তরণের উপায় কী?

---

[২১] Mookherjee N. 'Remembering to forget': public secrecy and memory of sexual violence in the Bangladesh war of 1971. Journal of the Royal Anthropological Institute. 2006 Jun;12(2):433-50.

[২২] বাংলাদেশ মুক্তিযোদ্ধা কল্যাণ ট্রাস্ট আইন, ২০১৮।

[২৩] আলী, 'বীরাঙ্গনাদের সীমাহীন ত্যাগ অতঃপর মুক্তিযোদ্ধার স্বীকৃতি', ১১ ডিসেম্বর ২০২০; sangbad.net.bd/opinion/post-editorial/21257/ (২৫ জানুয়ারি ২০২২)।

[২৪] *প্রাগুক্ত*।

[২৫] বীরাঙ্গনা গেজেট, মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়, বিস্তারিত দেখুনঃ molwa.gov.bd

গবেষণার উদ্দেশ্য

এই গবেষণার মূল উদ্দেশ্য মুক্তিযোদ্ধা হিসেবে বীরাঙ্গনাদের রাষ্ট্রীয় স্বীকৃতি এবং অধিকার প্রাপ্তির প্রক্রিয়া সুশাসনের দৃষ্টিকোণ থেকে পর্যালোচনা করা। সুনির্দিষ্ট উদ্দেশ্যসমূহ হচ্ছে-

১. বীরাঙ্গনাদের গেজেটভুক্তি ও সুবিধা প্রদান করা জন্য গৃহীত পরিকল্পনা ও কর্মসূচি পর্যালোচনা করা;
২. এই কার্যক্রমে বিদ্যমান সুশাসনের ঘাটতি, ঘাটতির কারণ ও ফলাফল বিশ্লেষণ করা;
৩. গবেষণার ফলাফলের আলোকে সুপারিশ প্রণয়ন করা।

গবেষণার পরিধি

বীরাঙ্গনাদের রাষ্ট্রীয় স্বীকৃতি এবং অধিকার প্রাপ্তির সাথে সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন কার্যক্রমের মধ্যে নিম্নোক্ত ক্ষেত্রসমূহ এই গবেষণার আওতাভুক্ত-

১. **চিহ্নিতকরণ প্রক্রিয়া:** বীরাঙ্গনাদের খুঁজে বের করার প্রক্রিয়া (কোনো নির্দিষ্ট কর্মপরিকল্পনা রয়েছে কিনা, এই প্রক্রিয়ায় কোনো ঘাটতি রয়েছে কিনা); বীরাঙ্গনাদের খুঁজে বের করা ও চিহ্নিত করার প্রক্রিয়ায় সরকারের ও বিভিন্ন অংশীজনের ভূমিকা;
২. **প্রত্যয়ন প্রক্রিয়া:** প্রত্যয়নের ধাপসমূহ (কাদের দ্বারা প্রত্যয়িত হতে হয়); প্রত্যয়ন প্রক্রিয়ায় বিদ্যমান জটিলতা বা অনিয়ম-দুর্নীতি;
৩. **আবেদন প্রক্রিয়া:** আবেদনের ধাপসমূহ; আবেদন প্রক্রিয়ায় সহযোগী বিভিন্ন অংশীজন; আবেদন প্রক্রিয়ায় বিদ্যমান জটিলতা বা অনিয়ম-দুর্নীতি;
৪. **যাচাই-বাছাই ও গেজেট ঘোষণা:** আবেদনকারী বীরাঙ্গনাদের সত্যতা যাচাই-বাছাই প্রক্রিয়া; যাচাই-বাছাই প্রক্রিয়ার সংবেদনশীলতা; যাচাই-বাছাই ও গেজেটভুক্তির প্রক্রিয়ায় বিদ্যমান জটিলতা বা অনিয়ম-দুর্নীতি;
৫. **ভাতা ও অন্যান্য সুবিধা প্রাপ্তি:** ভাতা ও অন্যান্য নির্ধারিত সুবিধাসমূহ; ভাতা ও সুবিধা প্রাপ্তিতে বিদ্যমান জটিলতা বা অনিয়ম-দুর্নীতি।

গবেষণা পদ্ধতি

এই গবেষণাটি মূলত গুণগত গবেষণা পদ্ধতিনির্ভর। এই গবেষণায় গুণগত তথ্য ব্যবহার করা হয়েছে। গবেষণার উদ্দেশ্যের সাথে সামঞ্জস্য রেখে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ উভয় উৎস থেকে তথ্য সংগ্রহ ও বিশ্লেষণ করে এই গবেষণায় ব্যবহার করা হয়েছে।

প্রত্যক্ষ তথ্য সংগ্রহ পদ্ধতি ও তথ্যের উৎস

প্রত্যক্ষ তথ্য সংগ্রহের পদ্ধতি হিসেবে সাক্ষাৎকার ও দলীয় আলোচনা পদ্ধতি ব্যবহার করা হয়েছে। নিম্নোক্ত উৎসসমূহ হতে তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে-

১. **সাক্ষাৎকার -** বীরাঙ্গনা মুক্তিযোদ্ধা, বীরাঙ্গনাদের নিয়ে কাজ করছে এমন ব্যক্তিবর্গ, সংশ্লিষ্ট সরকারি কর্মকর্তা
২. **দলীয় আলোচনা -** বীরাঙ্গনাদের নিয়ে কাজ করছে এমন প্রতিষ্ঠানের সদস্যবৃন্দ; সংশ্লিষ্ট সরকারি কর্মকর্তাবৃন্দ

সারণি-১: প্রত্যক্ষ তথ্য সংগ্রহের পদ্ধতি

তথ্য সংগ্রহের পদ্ধতি	তথ্যদাতার ধরন	তথ্যদাতার সংখ্যা
সাক্ষাৎকার	গেজেটভুক্ত ও ভাতাভুক্ত, আবাসনের জন্য আবেদনকারী এবং গেজেটভুক্তির জন্য আবেদনকারী বীরাঙ্গনা মুক্তিযোদ্ধা	৮ জন
	গেজেটভুক্তির জন্য এখনো আবেদন করেন নি এমন বীরাঙ্গনা মুক্তিযোদ্ধা	২ জন
	বীরাঙ্গনাদের নিয়ে কাজ করছেন এমন ব্যক্তিবর্গ (অ্যাকটিভিস্ট ও সাংবাদিক)	৩ জন
	সংশ্লিষ্ট সরকারি কর্মকর্তা (উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা, মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের সদস্য, জাতীয় মুক্তিযোদ্ধা কাউন্সিলের সদস্য, মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক যাদুঘরের সদস্য)	৮ জন
দলীয় আলোচনা	বীরাঙ্গনাদের নিয়ে কাজ করছে এমন প্রতিষ্ঠানের সদস্য (২টি প্রতিষ্ঠানের সদস্যদের সাথে ২টি পৃথক দলীয় আলোচনা)	১২ জন
	সংশ্লিষ্ট সরকারি কর্মকর্তা (উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা, সমাজসেবা কর্মকর্তা, এমআইএস কর্মকর্তা এবং অন্যান্য সংশ্লিষ্ট দুইজন ব্যক্তি)	৫ জন

তথ্য সংগ্রহের ক্ষেত্রে তথ্যদাতাদের স্বেচ্ছাপ্রণোদিত অংশগ্রহণের বিষয়টি নিশ্চিত করে তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে। এক্ষেত্রে বীরাঙ্গনাদের এবং তাদের নিয়ে কাজ করছে এমন ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠানের সদস্যদের খুঁজে বের করা এবং তথ্যদাতা হিসেবে নির্বাচন করার জন্য স্নোবল নমুনায়ন পদ্ধতি ব্যবহার করা হয়েছে। গোপনীয়তা ও সংবেদনশীলতা রক্ষার স্বার্থে গবেষণায় অংশগ্রহণকারী তথ্যদাতাদের পরিচিতি প্রকাশ করা হয় নি।

পরোক্ষ তথ্য সংগ্রহ পদ্ধতি ও তথ্যের উৎস:
সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয় ও সরকারি কার্যালয়ের ওয়েবসাইটে প্রকাশিত তথ্য, প্রকাশিত গেজেট এবং গণমাধ্যমে (প্রিন্ট ও ইলেক্ট্রনিক) প্রকাশিত প্রতিবেদন, প্রাসঙ্গিক বিভিন্ন বই ও প্রকাশিত প্রতিবেদন সংগ্রহ, যাচাই-বাছাই ও পর্যালোচনা করে এই গবেষণায় ব্যবহার করা হয়েছে।

বিশ্লেষণ কাঠামো:
সুশাসনের ছয়টি নির্দেশকের আলোকে গবেষণায় আওতাভুক্ত বিষয় বিশ্লেষণ করা হয়েছে। নির্দেশকসমূহ হচ্ছে-

১. **আইনের শাসন:** সুশাসনের এই নির্দেশকের আলোকে সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন প্রজ্ঞাপন বিশ্লেষণ করা হয়েছে।
২. **সক্ষমতা ও কার্যকরতা:** এই নির্দেশকের আলোকে বীরাঙ্গনাদের রাষ্ট্রীয় স্বীকৃতি ও অধিকার প্রদানের প্রক্রিয়ায় সংশ্লিষ্ট অংশীজনদের কার্যক্রম ও সক্ষমতা বিশ্লেষণ করা হয়েছে।
৩. **অংশগ্রহণ:** এই নির্দেশকের আলোকে স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠান, স্থানীয় জনগণ, বেসরকারি সংস্থা এবং অন্যান্য বিভিন্ন পক্ষের অংশগ্রহণ বিশ্লেষণ করা হয়েছে।
৪. **স্বচ্ছতা:** এই নির্দেশকের আলোকে তথ্যের ব্যবস্থাপনা ও সমন্বয় বিশ্লেষণ করা হয়েছে।
৫. **অনিয়ম ও দুর্নীতি:** এই নির্দেশকের আলোকে অনিয়ম ও দুর্নীতির ধরন, কারণ, দুর্নীতি প্রতিরোধমূলক ব্যবস্থা বিশ্লেষণ করা হয়েছে।
৬. **জবাবদিহিতা:** এই নির্দেশকের আলোকে নিয়ন্ত্রণ ও তদারকি এবং অভিযোগ নিরসন ব্যবস্থা বিশ্লেষণ করা হয়েছে।
৭. **সংবেদনশীলতা:** এই নির্দেশকের আলোকে বীরাঙ্গনাদের রাষ্ট্রীয় স্বীকৃতি ও অধিকার প্রদানের প্রক্রিয়ায় সংশ্লিষ্ট অংশীজন ও বিভিন্ন পক্ষের সংবেদনশীলতা বিশ্লেষণ করা হয়েছে।

তথ্য সংগ্রহের সময়কাল:
এই গবেষণায় ব্যবহৃত সকল তথ্য জানুয়ারি থেকে মার্চ ২০২২ পর্যন্ত সময়ে সংগ্রহ করা হয়েছে।

দ্বিতীয় অধ্যায়: বীরাঙ্গনাদের নিয়ে বিভিন্ন কার্যক্রম

বীরাঙ্গনাদের নিয়ে বিভিন্ন সরকারি কার্যক্রম:

২০১৫ সালের জানুয়ারি মাসে জাতীয় সংসদ বীরাঙ্গনাদের মুক্তিযোদ্ধার মর্যাদা দেওয়ার প্রস্তাব পাশ করার পর প্রজ্ঞাপন জারির মাধ্যমে তাদের জন্য কিছু অধিকার নিশ্চিত করা হয়েছে। এর মধ্যে রয়েছে গেজেটভুক্তি, মাসিক ভাতা বা সম্মানী, উৎসব ভাতা, মহান বিজয় দিবস ভাতা ও বাংলা নববর্ষ ভাতা, আবাসন সুবিধা, এবং বীর মুক্তিযোদ্ধার মৃত্যুতে রাষ্ট্রীয়ভাবে সম্মান প্রদর্শন। এছাড়া অনেকসময় জেলা পর্যায় হতে মুক্তিযোদ্ধাদের বিভিন্ন ধরনের উপহার বা সুবিধা প্রদান করা হয়ে থাকে। তবে সেগুলো নিয়মিত সরকারি কার্যক্রমের অন্তর্ভুক্ত নয়।

চিত্র-১: গেজেটভুক্তি ও অন্যান্য সুবিধা প্রাপ্তির প্রক্রিয়া

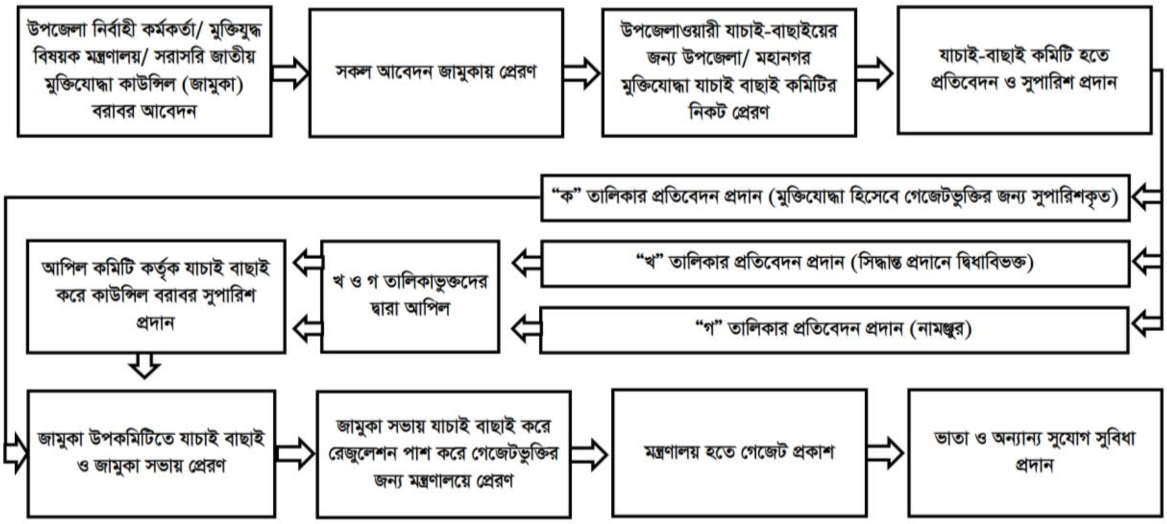

গেজেটভুক্তি:

১৯৭১ সালে পাক হানাদার বাহিনী ও তাদের সহযোগী কর্তৃক নির্যাতিত কোনো নারী (বীরাঙ্গনা) বা তার অবর্তমানে তার পরিবারের কোনো সদস্য যদি স্বেচ্ছায় গেজেটভুক্তির জন্য আবেদন করে তাহলে যথাযথ যাচাই-বাছাই প্রক্রিয়া সম্পন্ন করে তাকে মুক্তিযোদ্ধা (বীরাঙ্গনা) তালিকায় অন্তর্ভুক্ত করা হবে। একজন বীরাঙ্গনার রাষ্ট্রীয় স্বীকৃতির প্রথম ধাপ হচ্ছে গেজেটভুক্ত হওয়া। গেজেটভুক্ত হওয়ার মধ্য দিয়ে একজন বীরাঙ্গনা নির্ধারিত সকল সুবিধা পাওয়ার জন্য বিবেচিত হবেন। "জাতীয় মুক্তিযোদ্ধা কাউন্সিল আইন, ২০০২" এর ৭(ঝ) ধারা অনুসারে মুক্তিযোদ্ধা হিসেবে গেজেটভুক্তির জন্য জাতীয় মুক্তিযোদ্ধা কাউন্সিল (জামুকা) আবেদন গ্রহণ ও যথাযথভাবে যাচাই-বাছাই প্রক্রিয়া সম্পন্ন করে গেজেটভুক্তির সুপারিশ করে থাকে (চিত্র ১ দ্রষ্টব্য)।[২৬]

গেজেটভুক্তির ধাপসমূহ নিম্নরূপ-

১. **গেজেটভুক্তির জন্য আবেদন:** ১৯৭১ সালে পাক হানাদার বাহিনী ও তাদের সহযোগী কর্তৃক নির্যাতিত কোনো নারী (বীরাঙ্গনা) গেজেটভুক্ত হতে চাইলে জামুকা বরাবর আবেদন করতে হবে। এক্ষেত্রে স্ব স্ব উপজেলায় উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা বরাবর আবেদন জমা করতে পারেন অথবা সরাসরি জামুকা বরাবর অথবা মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়ে আবেদন করতে পারেন। উল্লেখ্য বর্তমানে অনলাইনে আবেদন করার ব্যবস্থাও রয়েছে। সকল আবেদন জামুকাতে প্রেরণ করা হয়।

২. **উপজেলাওয়ারী যাচাই-বাছাইয়ের জন্য উপজেলা/ মহানগর মুক্তিযোদ্ধা যাচাই-বাছাই কমিটির নিকট প্রেরণ:** সরাসরি এবং অনলাইনে প্রাপ্ত আবেদনসমূহ জামুকা হতে উপজেলাওয়ারী/মহানগরওয়ারী মুক্তিযোদ্ধা যাচাই-বাছাই কমিটির নিকট প্রেরণ করা হয়। যাচাই-বাছাইয়ের জন্য উপজেলাওয়ারী ৩-৫ সদস্য বিশিষ্ট কমিটি গঠন করা হয়ে থাকে। উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তার সভাপতিত্বে ১ম শ্রেণির মহিলা কর্মকর্তাদের সমন্বয়ে এই কমিটি গঠিত হয়।

---

[২৬] মুক্তিযোদ্ধা গেজেটভুক্তির প্রক্রিয়া, জাতীয় মুক্তিযোদ্ধা কাউন্সিল, বিস্তারিত দেখুন: http://www.jamuka.gov.bd/site/page/2c18b120-5a43-45f5-a4f0-666e92b8d595/

৩. **যাচাই-বাছাই কমিটি হতে প্রতিবেদন ও সুপারিশ প্রদান:** বীর মুক্তিযোদ্ধা যাচাই-বাছাই নীতিমালা-২০১৬ অনুসারে জামুকা উপজেলা/ মহানগর মুক্তিযোদ্ধা যাচাই-বাছাই কমিটির নিকট হতে "ক", "খ" ও "গ" তালিকার প্রতিবেদন চাওয়া হয়। এক্ষেত্রে ক=মুক্তিযোদ্ধা হিসেবে গেজেট ভুক্তির জন্য সুপারিশকৃত, খ=সিদ্ধান্ত প্রদানে দ্বিধাবিভক্ত এবং গ= নামঞ্জুর। উপজেলা/ মহানগর মুক্তিযোদ্ধা যাচাই-বাছাই কমিটি মুক্তিযোদ্ধা হিসেবে গেজেটভুক্তির জন্য সুপারিশ করে "ক" তালিকার প্রতিবেদন জামুকা কমিটিতে পেশ করেন। এছাড়া উপজেলা/ মহানগর মুক্তিযোদ্ধা যাচাই-বাছাই কমিটির নিকট হতে "খ" ও "গ" তালিকায় সুপারিশকৃতদের নীতিমালায় আপিল করার ব্যবস্থা রাখা হয়। প্রদত্ত নির্ধারিত সময়ে আপিল আবেদনসমূহ সাক্ষ্য ও প্রমাণাদির ভিত্তিতে যাচাই-বাছাই করে আপিল কমিটি কাউন্সিলের নিকট সুপারিশ প্রদান করে।

৪. **জামুকা উপকমিটিতে যাচাই-বাছাই ও জামুকা সভায় প্রেরণ:** উপজেলা/ মহানগর মুক্তিযোদ্ধা যাচাই-বাছাই কমিটির নিকট হতে প্রাপ্ত "ক" তালিকার সুপারিশপ্রাপ্তদের আবেদন এবং তথ্যপ্রমাণসমূহ জামুকার বিভাগীয় সদস্য কর্তৃক যাচাই করে কাউন্সিলের নিকট প্রতিবেদন ও সুপারিশ পেশ করা হয়।

৫. **জামুকা সভায় যাচাই-বাছাই করে রেজুলেশন পাশ করে গেজেটভুক্তির জন্য মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ:** পরিশেষে কাউন্সিলের অনুমোদনের প্রেক্ষিতে গেজেট প্রকাশের জন্য মন্ত্রণালয়ে সুপারিশ প্রেরণ করা হয়।

৬. **মন্ত্রণালয় হতে গেজেট প্রকাশ:** জামুকা হতে সুপারিশের প্রেক্ষিতে মন্ত্রণালয়ের অধীনে বিডি প্রেস হতে গেজেট প্রকাশ করা হয়।

৭. **ভাতা ও অন্যান্য সুযোগ সুবিধা প্রদান:** গেজেট প্রকাশের সাথে সাথে একজন মুক্তিযোদ্ধা (বীরাঙ্গনা) নির্ধারিত সকল রাষ্ট্রীয় সুবিধা প্রাপ্তির যোগ্য বলে বিবেচিত হয়ে থাকেন।

মাসিক ভাতা:

বীরাঙ্গনা মুক্তিযোদ্ধাদের সাধারণ মুক্তিযোদ্ধা শ্রেণিতে (ক্যাটাগরিতে) মাসিক ভাতা প্রদান করা হয়ে থাকে। বর্তমানে মাসিক ২০,০০০ টাকা করে ভাতা প্রদান করা হচ্ছে। নতুন এই ভাতার পরিমাণ কার্যকর হয়েছে **১** জুলাই **২০২১** থেকে। এর পূর্বে ২০১৯-২০২০ অর্থ বছরে মাসিক ভাতার পরিমাণ ছিল **১২**,০০০ টাকা এবং **২০১৯-২০২০** অর্থ বছরে মাসিক ভাতার পরিমাণ ছিল **১০**,০০০ টাকা।[২৭] সুবিধাভোগীর ব্যাংক হিসাবে বাংলাদেশ মুক্তিযোদ্ধা কল্যাণ ট্রাস্ট কর্তৃক প্রতি মাসে বা ত্রৈমাসিক ভিত্তিতে সম্মানি ভাতা প্রদান করা হয়ে থাকে।[২৮] গভর্নমেন্ট টু পারসন (জি টু পি) পদ্ধতিতে বাংলাদেশ ব্যাংক হতে মোবাইল মেসেজের মাধ্যমে সরাসরি বীর মুক্তিযোদ্ধার অ্যাকাউন্টে ভাতার টাকা প্রদান করা হয়। এ পদ্ধতিতে সকল আনুষঙ্গিক সার্ভিস চার্জ সরকারের পক্ষ হতে বহন করা হয়ে থাকে।

উৎসব ভাতা, মহান বিজয় দিবস ভাতা ও বাংলা নববর্ষ ভাতা:

মাসিক সম্মানী ভাতার পাশাপাশি **১০** হাজার টাকা হারে দুটি উৎসব ভাতা, বাংলা নববর্ষ ভাতা হিসেবে দুই হাজার টাকা এবং জীবিত বীর মুক্তিযোদ্ধাদের মহান বিজয় দিবস ভাতা হিসাবে পাঁচ হাজার টাকা প্রদান করা হয়ে থাকে।[২৯] সুবিধাভোগীর ব্যাংক হিসাবে বাংলাদেশ মুক্তিযোদ্ধা কল্যাণ ট্রাস্ট কর্তৃক প্রতি উৎসবের **১৫** দিন পূর্বে ভাতার টাকা প্রদান করা হয়ে থাকে।[৩০]

আবাসন সুবিধা:

মুক্তিযোদ্ধাদের মধ্যে যারা অস্বচ্ছল তারা সরকারের পক্ষ হতে বাড়ি বরাদ্দ পেয়ে থাকেন। "অসচ্ছল বীর মুক্তিযোদ্ধাদের জন্য আবাসন নির্মাণ" প্রকল্পের অধীনে অসহায় এবং আর্থিকভাবে অসচ্ছল মুক্তিযোদ্ধাদের আবাসন সুবিধা প্রদান করা হয়ে থাকে। চার ডেসিমাল জমিতে ৯০০ বর্গফুট আয়তনের 'বীর নিবাস' নামক একতলা এই বাড়িতে দুটি বেডরুম বারান্দাসহ আলাদা বাথরুম, টিউবওয়েল এবং গরু-ছাগল, হাঁস-মুরগি পালনের জন্য পৃথক শেডের ব্যবস্থা রয়েছে। এ আবাসন বরাদ্দের জন্য অসচ্ছল বীর মুক্তিযোদ্ধা, শহীদ-প্রয়াত বীর মুক্তিযোদ্ধার বিধবা স্ত্রী ও সন্তান আবেদন করতে পারেন। বীরাঙ্গনাদের ক্ষেত্রে মুক্তিযুদ্ধবিষয়ক মন্ত্রণালয় থেকে আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে সরাসরি বরাদ্দ দেওয়া হয়ে থাকে। এক্ষেত্রে কোনো যাচাই-বাছাই ছাড়াই আবেদনটি উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা সরাসরি মুক্তিযুদ্ধবিষয়ক মন্ত্রণালয়ে পাঠান এবং মুক্তিযুদ্ধবিষয়ক মন্ত্রণালয় যাচাই-বাছাই শেষে সরাসরি আবাসন বরাদ্দ প্রদান করে থাকে। এক্ষেত্রে আবেদনকারীর অবশ্যই দৈর্ঘ্য **৩৯** ফুট × প্রস্থ **২৯** ফুট নিষ্কন্টক নিজ নামে জমি থাকার শর্ত রয়েছে। 'বীর নিবাস' হতে প্রাপ্ত এই বাড়ি কোনোভাবেই বিক্রি বা অন্য কোনো কাজে ব্যবহার করার ক্ষেত্রে নিষেধাজ্ঞা রয়েছে। নির্মিত বাড়ির মূল অবকাঠামোগত কোনো পরিবর্তন-পরিবর্ধন বা উর্ধ্বমুখী সম্প্রসারণ করার বিষয়েও নিষেধাজ্ঞা রয়েছে। বাড়িতে

---

[২৭] *প্রথম আলো*, 'বীর মুক্তিযোদ্ধাদের সম্মানী ভাতা হচ্ছে ২০,০০০ টাকা', ৯ জুন ২০২১; www.prothomalo.com/business/ (২৫ জানুয়ারি ২০২২)।

[২৮] সম্মানী ভাতা বিতরণ বিষয়ক প্রজ্ঞাপন, মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়, বিস্তারিত দেখুন: dpp.gov.bd/upload_file/gazettes/40559_50451.pdf

[২৯] সব বীর মুক্তিযোদ্ধা পাবেন উৎসব-নববর্ষ-বিজয় দিবস ভাতা, ৫ এপ্রিল ২০২১; www.jagonews24.com/national/news/656377# (২৬ জানুয়ারি ২০২২)।

[৩০] নাগরিক সেবা, বাংলাদেশ মুক্তিযোদ্ধা কল্যাণ ট্রাস্ট, বিস্তারিত দেখুন: http://www.bffwt.gov.bd/

কোনো ধরনের সংস্কার, মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণের দরকার হলে তার জন্য প্রয়োজনীয় ব্যয় বরাদ্দপ্রাপ্ত সুবিধাভোগীকে নিজ খরচে বহন করতে হয়।[৩১]

বীর মুক্তিযোদ্ধার মৃত্যুতে রাষ্ট্রীয়ভাবে সম্মান প্রদর্শন:
বীর মুক্তিযোদ্ধার মৃত্যুতে রাষ্ট্রীয়ভাবে সম্মান প্রদর্শন আদেশ, ২০২০ অনুযায়ী মৃত্যুর পর গেজেটভুক্ত একজন নারী মুক্তিযোদ্ধা (বীরাঙ্গনা) রাষ্ট্রীয় সম্মাননা পেয়ে থাকেন। রাষ্ট্রীয় মর্যাদায় তাঁর লাশ দাফন, সৎকার বা সমাধিস্থ করা হয়ে থাকে।[৩২]

গেজেটভুক্ত বীরাঙ্গনাদের সংখ্যা:
২৪ মে ২০২২ পর্যন্ত গেজেটভুক্ত মোট বীরাঙ্গনা মুক্তিযোদ্ধার সংখ্যা ৪৪৮ জন (মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের ওয়েবসাইট অনুযায়ী)।[৩৩] মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের এমআইএস-এ এন্ট্রি রয়েছে ৪০২ জনের তালিকা।[৩৪] আটটি বিভাগের মধ্যে সবচেয়ে বেশি গেজেটভুক্ত হয়েছে রাজশাহী বিভাগে **১০৭** জন। এরপরে রয়েছে রংপুর বিভাগ, এ বিভাগে গেজেটভুক্ত হয়েছে **৬১** জন। সিলেট, ঢাকা ও ময়মনসিংহ বিভাগে গেজেটভুক্ত বীরাঙ্গনার সংখ্যা প্রায় কাছাকাছি, ৫৩, ৫৩ এবং **৫১** জন। খুলনা ও বরিশাল বিভাগের যথাক্রমে গেজেটভুক্ত হয়েছে ৫০ ও ৪৩ জন। এখন পর্যন্ত সবচেয়ে কম গেজেটভুক্ত হয়েছে চট্টগ্রাম বিভাগে, ৩০ জন। এখন পর্যন্ত একজন করে গেজেটভুক্ত হয়েছে এমন জেলার সংখ্যা ৮টি। চট্টগ্রাম বিভাগের ফেনী, খাগড়াছড়ি ও নোয়াখালী; বরিশাল বিভাগের ভোলা; ঢাকা বিভাগের মুন্সিগঞ্জ ও নারায়ণগঞ্জ; রংপুর বিভাগের নীলফামারী এবং ময়মনসিংহ বিভাগের নেত্রকোণা জেলায় গেজেটভুক্ত বীরাঙ্গনার সংখ্যা একজন করে। এখন পর্যন্ত একজন বীরাঙ্গনাও গেজেটভুক্ত হয়নি এমন জেলার সংখ্যা ৮টি। চট্টগ্রাম বিভাগের চাঁদপুর, কক্সবাজার ও বান্দরবন; খুলনা বিভাগের মেহেরপুর ও মাগুরা; ঢাকা বিভাগের মানিকগঞ্জ ও রাজবাড়ি এবং রংপুর বিভাগের পঞ্চগড় জেলায় এখন পর্যন্ত একজন বীরাঙ্গনাও গেজেটভুক্ত হয়নি। ক্ষুদ্র নৃতাত্ত্বিক গোষ্ঠী হতে এখন পর্যন্ত গেজেটভুক্ত হয়েছেন তিন জন বীরাঙ্গনা।[৩৫]

সারণি-২: বীরাঙ্গনাদের গেজেটভুক্তির সার্বিক চিত্র

ক্রম	বিভাগ	গেজেটভুক্ত বীরাঙ্গনার সংখ্যা	একজন করে গেজেটভুক্ত হয়েছে এমন জেলা	গেজেটভুক্ত হয় নি এমন জেলা
১	চট্টগ্রাম	৩০	ফেনী, খাগড়াছড়ি, নোয়াখালী	চাঁদপুর, কক্সবাজার, বান্দরবন
২	রাজশাহী	**১০৭**	-	-
৩	খুলনা	৫০	-	মেহেরপুর ও মাগুরা
৪	বরিশাল	৪৩	ভোলা	-
৫	সিলেট	৫৩	-	-
৬	ঢাকা	৫৩	মুন্সিগঞ্জ ও নারায়ণগঞ্জ	মানিকগঞ্জ ও রাজবাড়ি
৭	রংপুর	৬১	নীলফামারী	পঞ্চগড়
৮	ময়মনসিংহ	৫১	নেত্রকোণা	-
	মোট	**৪৪৮**	-	-

উল্লেখ্য, বীরাঙ্গনাদের অধিকার নিয়ে সংঘবদ্ধভাবে কাজ শুরু হয়েছিল রাজশাহী বিভাগের সিরাজগঞ্জ থেকে। নারী পুনর্বাসন বোর্ডের অধীনে **১৯৭২** সালে সিরাজগঞ্জের বিএ কলেজ মাঠে বীরাঙ্গনা নারী পুনর্বাসন কেন্দ্র প্রতিষ্ঠা করা হয় যেখানে **৩৬** জন বীরাঙ্গনা আশ্রয় নেন। এ সংগঠনের সাধারণ সম্পাদকের দায়িত্বে ছিলেন সাফিনা লোহানী। **১৯৭৫** সালের পরে দেশের অন্যান্য পুনর্বাসন কেন্দ্রের মতো এ কেন্দ্রটি বন্ধ করে দেওয়া হলে সেখানে আশ্রয় নেওয়া অসহায় বীরাঙ্গনারা নানা স্থানে ছড়িয়ে ছিটিয়ে পড়েন। পরবর্তীতে **১৯৭৮** সালে সিরাজগঞ্জ উত্তরণ মহিলা সংস্থার মাধ্যমে আশ্রয় নেওয়া ঐসব বীরাঙ্গনাদের খুঁজে বের করার চেষ্টা শুরু হয়, এবং ৩৬ জনের মধ্যে **২১** জন বীরাঙ্গনার সন্ধান পাওয়া যায়। তখন তাদেরকে ঐক্যবদ্ধ করে তাদের জন্য সহায়তার ব্যবস্থা করার সাথে সাথে তাদের সরকারি স্বীকৃতির জন্য বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়। বিভিন্ন মহলে বীরাঙ্গনাদের অধিকারের জন্য অ্যাডভোকেসি করা হয়। এক পর্যায়ে **১৯৯৬** সালে নাট্য ব্যক্তিত্ব নাসির উদ্দিন ইউসুফ বাচ্চুর উপস্থাপনায় চ্যানেল আই-এর একটি অনুষ্ঠানে ৮ বীরাঙ্গনার সাক্ষাৎকার প্রচার করা হয় যেখানে দেশবাসীর সামনে সিরাজগঞ্জের নির্যাতিত বীরাঙ্গনা নারীদের অসহায় জীবনযাপনের বিষয়টি তুলে ধরা হয় এবং মিডিয়া ফলোআপ-এর মাধ্যমে বিভিন্ন মহলের দৃষ্টি আকর্ষণের চেষ্টা অব্যাহত রাখা হয়। এরই ধারাবাহিকতায় **২০১৪** সালের জানুয়ারি মাসে সিরাজগঞ্জ শহরের সালেহা ইসহাক সরকারি উচ্চ বালিকা বিদ্যালয়ের প্রাক্তন

[৩১] *যুগান্তর*, 'মুজিববর্ষেই দ্বিগুন হলো বীর নিবাস', ২৭ মার্চ, ২০২১; www.jugantor.com/todays-paper/first-page/405912/ (২৫ জানুয়ারি ২০২২)।

[৩২] বীর মুক্তিযোদ্ধার মৃত্যুতে রাষ্ট্রীয়ভাবে সম্মান প্রদর্শন আদেশ, ২০২০, বিস্তারিত দেখুন: http://www.molwa.gov.bd/sites/default/files/files/molwa.portal.gov.bd/policies/b693a503_c383_4e07_83c0_925f6a5dc06f/

[৩৩] বীরাঙ্গনা গেজেট, মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়, বিস্তারিত দেখুন: http://www.molwa.gov.bd/

[৩৪] বীরাঙ্গনা গেজেট, মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়, বীর মুক্তিযোদ্ধা তথ্য ব্যবস্থাপনা সিস্টেম, বিস্তারিত দেখুন: http://www.molwa.gov.bd/

[৩৫] *প্রাগুক্ত*।

ছাত্রী সংগঠনের সভাপতি মিতালী হোসেন ও বাংলাদেশ জাতীয় মহিলা আইনজীবী সমিতির নির্বাহী পরিচালক সালমা আলী বীরাঙ্গনাদের রাষ্ট্রীয় স্বীকৃতি চেয়ে উচ্চ আদালতে রিট আবেদন করেন।[৩৬] প্রথম ধাপে যে ৪১ জন বীরাঙ্গনা গেজেটভুক্ত হন তার মধ্যে সিরাজগঞ্জের ১৩ জনসহ রাজশাহী বিভাগে মোট ২৪ জন তালিকাভুক্ত হয়। বিভিন্ন ধাপে এখন পর্যন্ত এ বিভাগ হতে বীরাঙ্গনাদের তালিকাভুক্তির সংখ্যা ১০৭ জন যা বিভাগভিত্তিক হারে সর্বোচ্চ।[৩৭]

বেসরকারি কার্যক্রম:
বীরাঙ্গনাদের নিয়ে প্রাতিষ্ঠানিক ও ব্যক্তিগত পর্যায়ে কিছু কিছু পক্ষ কাজ করে থাকেন। প্রাতিষ্ঠানিক পর্যায়ে নারীপক্ষ ২০১৪ সাল থেকে বীরাঙ্গনাদের নিয়ে কাজ করছে। বর্তমানেও তাদের কার্যক্রম চলমান। বীরাঙ্গনাদের অধিকার নিয়ে কাজ করেছে এমন আরেকটি প্রতিষ্ঠান হচ্ছে ঘাসফুল। চট্টগ্রামভিত্তিক এই প্রতিষ্ঠানটি বীরাঙ্গনা খঞ্জনীকে খুঁজে বের করতে এবং রাষ্ট্রীয় সম্মান প্রদানে সহায়তার করার জন্য একনিষ্ঠভাবে কাজ করেছিল। বর্তমানে তাদের বীরাঙ্গনাদের নিয়ে কোনো কার্যক্রম নেই। গণস্বাস্থ্যকেন্দ্র সরাসরি বীরাঙ্গনাদের নিয়ে পৃথক কোনো কার্যক্রম পরিচালনা করে না। তবে এই প্রতিষ্ঠানটির পক্ষ হতে বীরাঙ্গনাদেরকে বিনামূল্যে চিকিৎসা সেবা প্রদান করা হয়ে থাকে। এছাড়াও স্থানীয় ও জাতীয় পর্যায়ে কিছু প্রতিষ্ঠান বীরাঙ্গনাদের নিয়ে কিছু কিছু কাজ করে থাকেন। এক্ষেত্রে বীরাঙ্গনাদের সংবর্ধনা দেওয়া, উপহার প্রদান এবং এককালীন সহায়তার মতো কার্যক্রম তারা করে থাকেন।

প্রাতিষ্ঠানিক পরিসর ছাড়াও ব্যক্তিগত পর্যায়ে অনেকে বীরাঙ্গনাদের নিয়ে কাজ করে থাকেন। এক্ষেত্রে স্থানীয় ব্যক্তিবর্গ, অ্যাক্টিভিস্ট, সাংবাদিক, মুক্তিযোদ্ধা ও সমাজসেবকদের ভূমিকা উল্লেখযোগ্য।

প্রাতিষ্ঠানিক ও ব্যক্তিগত পর্যায়ে বীরাঙ্গনাদের নিয়ে যেসব কার্যক্রমসমূহ রয়েছে তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য কার্যক্রমসমূহ নিম্নরূপ:

- **বীরাঙ্গনাদেরকে খুঁজে বের করা:** বীরাঙ্গনাদের খুঁজে বের করার ক্ষেত্রে স্থানীয় পর্যায়ে বিভিন্ন ব্যক্তি, অ্যাক্টিভিস্ট, সাংবাদিক, মুক্তিযোদ্ধা, সমাজসেবকরা বিশেষ ভূমিকা পালন করে থাকেন। প্রাতিষ্ঠানিকভাবে যারা কাজ করেন তাদের এক্ষেত্রে নিজস্ব কোনো মাধ্যম নেই, বীরাঙ্গনাদের খুঁজে বের করতে তারা বিভিন্ন স্বেচ্ছাসেবী ব্যক্তিদের সহায়তা নিয়ে থাকেন।
- **বীরাঙ্গনা এবং তাদের পরিবার পরিজনদেরকে সচেতন করা:** বীরাঙ্গনা এবং তাদের পরিবার পরিজনদের বীরাঙ্গনাদের অধিকারের বিষয়ে সচেতন করার জন্য স্থানী পর্যায়ে বিভিন্ন ব্যক্তি, অ্যাক্টিভিস্ট, সাংবাদিক, মুক্তিযোদ্ধা, সমাজসেবকরা এবং প্রাতিষ্ঠানিক পর্যায়ের প্রতিনিধিরা নিজ নিজ অবস্থান থেকে ভূমিকা পালন করে থাকেন।
- **সচেতনতা তৈরির জন্য কাজ করা:** লেখালেখি ও মিডিয়ার সহায়তায় বীরাঙ্গনাদের অবস্থা তুলে ধরা এবং তাদের অধিকার নিশ্চিত করার জন্য ও সামাজিক সচেতনতা তৈরির জন্য অবিরামভাবে কাজ করছে বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান ও ব্যক্তিবর্গ।
- **স্বল্প পরিসরে ভাতার ব্যবস্থা করা:** যেসব বীরাঙ্গনা এখনো তালিকাভুক্ত হয়ে সম্মানীভাতা পান না তাদের মাসিক ২,০০০ টাকা করে সম্মানী ভাতা দেওয়া হয়। সরকারি ভাতাভুক্ত হওয়ার আগ পর্যন্ত এই ভাতা নিয়মিত প্রদান করা হয়। বর্তমানে এমন ২৩ জন বীরাঙ্গনাকে নারীপক্ষ মাসিক ভাতা প্রদান করছে। কিছু কিছু স্বেচ্ছাসেবী ব্যক্তিগত পরিসর হতেও বীরাঙ্গনাদের আর্থিক সহায়তা করে থাকেন, তবে তা নিয়মিত নয়।
- **বীরাঙ্গনাদের জন্য চিকিৎসাসেবার ব্যবস্থা করা:** গণস্বাস্থ্যকেন্দ্র বীরাঙ্গনাদেরকে বিনামূল্যে চিকিৎসা সেবা দিয়ে থাকে। নারীপক্ষ এক্ষেত্রে বীরাঙ্গনাদের চিকিৎসার জন্য ঢাকায় আনার এবং থাকার ব্যবস্থা করে থাকে।
- **গেজেটভুক্তির প্রক্রিয়ায় সহায়তা:** যেসব ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠান বীরাঙ্গনাদের নিয়ে কাজ করছে তাদের প্রায় সকলেই বীরাঙ্গনাদের গেজেটভুক্তির প্রক্রিয়ায় বিভিন্নভাবে সহায়তা করে থাকেন।
- **আবাসন কার্যক্রম:** বীরাঙ্গনাদের জন্য আবাসন সুবিধার ব্যবস্থা করার জন্য নারীপক্ষের একটি কার্যক্রম পরিকল্পনায় রয়েছে।

---
[৩৬] নারী মুক্তিযোদ্ধা ও তাঁদের 'মা' সাফিনা লোহানীর কথা, ২৫ মার্চ, ২০১৮; ২৫ জানুয়ারি ২০২২ তারিখে সংগৃহীত, বিস্তারিত দেখুন: www.dw.com/bn/নারী-মুক্তিযোদ্ধা-ও-তাঁদের-মা-সাফিনা-লোহানীর-কথা/a-43126890
[৩৭] *প্রাগুক্ত*।

তৃতীয় অধ্যায়: বীরাঙ্গনাদের রাষ্ট্রীয় স্বীকৃতি ও অধিকার প্রাপ্তির প্রক্রিয়ায় চ্যালেঞ্জ

১. আইনের শাসন

২০১৫ সালে প্রজ্ঞাপন জারির মধ্য দিয়ে বীরাঙ্গনাদেরকে মুক্তিযোদ্ধা হিসেবে রাষ্ট্রীয় স্বীকৃতি ও অধিকার প্রদানের সরকারি কার্যক্রম শুরু হয়। কিন্তু শুরু থেকে এখন পর্যন্ত রাষ্ট্রীয় স্বীকৃতি ও অধিকার প্রাপ্তির এই প্রক্রিয়ায় বীরাঙ্গনাদের নানা ধরনের চ্যালেঞ্জের মধ্য দিয়ে যেতে হচ্ছে। নিচে সংশ্লিষ্ট বিধিগত সীমাবদ্ধতা ধরন ও তার ফলাফল নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে।

১.১ দীর্ঘসূত্রতার চ্যালেঞ্জ:

গেজেটভুক্তির আবেদন হতে শুরু করে গেজেটভুক্তি জন্য সর্বোচ্চ কতদিনে মধ্যে কার্যক্রম নিস্পত্তি করতে হবে তার জন্য কোনো নির্দিষ্ট সময়সীমা, জামুকা অ্যাক্ট বা মুক্তিযোদ্ধা কল্যাণ ট্রাস্ট আইন বা গেজেট বা প্রজ্ঞাপনে উল্লেখ নেই।[৩৮] ফলে গেজেটভুক্তির এই প্রক্রিয়া সম্পন্ন করতে অনেকক্ষেত্রেই দীর্ঘ সময় লেগে যায়–কোনো কোনো ক্ষেত্রে ৩ বছরেরও বেশি সময় লেগে যায়। গেজেটভুক্তির এই প্রক্রিয়ায় কত সময় লাগতে পারে বা কত সময় লাগা উচিত এই বিষয়ে প্রশাসনের তরফ থেকেও কোনো তাগিদ নেই। প্রক্রিয়া সম্পন্ন করার কোনো নির্দিষ্ট সময়সীমা নেই, প্রক্রিয়া সম্পন্ন হতে যতটা সময় প্রয়োজন সেটাই লেগে থাকেন বলে তারা মনে করেন।

আবেদন জমাদান হতে যাচাই-বাছাই কমিটিতে প্রেরণ, যাচাই-বাছাই সম্পন্নকরণ এবং জামুকা কমিটি হতে গেজেটভুক্তির জন্য মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ – এই পুরো প্রক্রিয়ার কোথাও কোনো কার্যনিষ্পত্তির জন্য নির্দিষ্ট সময়সীমা অনুসরণ করা হয় না। ফলে পুরো প্রক্রিয়াটি সম্পন্ন হতে বেশিরভাগ ক্ষেত্রে দীর্ঘ সময় অতিবাহিত হয়ে যায়।

> **"গেজেটভুক্তির জন্য কত সময় লাগবে এটা নির্দিষ্ট করে বলার কিছু নেই। কারও ৩ মাসও লাগতে পারে কারও ৩ বছর। প্রক্রিয়ায় যেই সময় লাগবে সেটাই।"**
> *- সংশ্লিষ্ট একজন সরকারি কর্মকর্তার সাক্ষাৎকার*

গেজেটভুক্তির পর ভাতা প্রাপ্তির ক্ষেত্রেও রয়েছে দীর্ঘসূত্রতার অভিযোগ। গেজেটভুক্তির পর ভাতা পেতে কোনো কোনো ক্ষেত্রে ৩-৬ মাস বা এর থেকেও বেশি সময় লেগে যায়। সম্মানি ভাতার জন্য আবেদন করা পর আবেদন প্রাপ্তির তারিখ হতে পরবর্তী ৬০(ষাট) কার্যদিবসের মধ্যে আবেদনটি নিস্পত্তি করার নির্দেশনা[৩৯] থাকলেও অনেকক্ষেত্রেই তা যথাযথভাবে পালিত না হওয়ায় ভাতা প্রাপ্তি প্রক্রিয়াও দীর্ঘ হয়ে পড়ে।

গেজেটভুক্তি ও ভাতা প্রাপ্তির প্রক্রিয়ায় বিদ্যমান এই দীর্ঘসূত্রতা সুবিধাপ্রাপ্তির প্রক্রিয়াটিকে জটিল করে তুলেছে। অনেকক্ষেত্রেই প্রক্রিয়াগত দীর্ঘসূত্রতা সুবিধাভোগীদেরকে সুবিধাগ্রহণে নিরুৎসাহিত করে এবং অন্যান্য বিভিন্ন জটিলতার সৃষ্টি করে। ফলে যাদের স্বার্থে এই সুবিধা তাদের পক্ষেই এটি ব্যবহারের অনুপযোগী হয়ে পড়ে। এই প্রসঙ্গে একজন স্বেচ্ছাসেবী বলেন, "এই পুরো প্রক্রিয়াটাই সময়সাপেক্ষ। সরকারি সব প্রক্রিয়া যেমনটা হয় আরকি। এখন সব প্রক্রিয়ার মতো এটা হলে তো মুশকিল। স্বাধীনতার এতো বছর পর তাদের জন্য সরকার এই ব্যবস্থা করলো, এখন এটা যদি তারা জীবদ্দশায় ভোগই করতে না পারে তাহলে আর কি লাভ! এখন তাদের কারও বয়সই কিন্তু কম না। সবাই-ই জীবনের শেষ প্রান্তে চলে এসেছে। এখন সরকারের উচিত এর জন্য মোবাইল কোর্ট জাতীয় কিছু করা। দ্রুত সময়ের মধ্যে প্রক্রিয়া সম্পন্ন করার জন্য বিশেষ ব্যবস্থা নেওয়া।"

প্রক্রিয়াগত এই দীর্ঘসূত্রতা সামাজিক পরিসরেও বীরাঙ্গনাদের জন্য জটিলতার সৃষ্টি করে। অনেকক্ষেত্রেই বহু বছর ধরে উপেক্ষিত একজন বীরাঙ্গনা যখন নিজের প্রাপ্য রাষ্ট্রীয় স্বীকৃতি ও অধিকারের জন্য আবেদন করেন তখন তা বাস্তবায়ন হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত তাকে নানা ধরনের নিপীড়নের মধ্য দিয়ে যেতে হয়, সমাজের নানা কটু কথার সম্মুখীন হতে হয়। এই প্রসঙ্গে একজন বীরাঙ্গনা বলেন, "আবেদন করার পরে কত সময় যে লাগছিলো। তখন মনে হইছিলো আর পারতাছি না। লোকজন তখন আরও বেশি খোঁচায় খোঁচায় কইতো, 'কই তোগো বাপ মা'য়রা না কত কিছু দিবো। পাঞ্জাবিরা তো গেছে, ওগো ভাড়া না পাবি। কই কিছু তো দেয় না এখনো'। বাঁইচা থাকাটাই তখন দায় হইয়া গেছিলো।"

---

[৩৮] জামুকা অ্যাক্ট ২০০২, বিস্তারিত দেখুন, http://www.jamuka.gov.bd/sites/default/files/files/jamuka.portal.gov.bd/law/984bb742_762a_46ef_87df_a0acda31452b/Jamuca%20Act,2002.pdf; মুক্তিযোদ্ধা কল্যাণ ট্রাস্ট আইন ২০১৮, বিস্তারিত দেখুন, http://www.molwa.gov.bd/sites/default/files/files/molwa.portal.gov.bd/page/802824c6_af5c_49c6_9ac2_de6bbbff58ed/

[৩৯] ভূমিহীন ও অস্বচ্ছল মুক্তিযোদ্ধাদের জন্য বাসস্থান নির্মাণ প্রকল্প, বিস্তারিত দেখুন, http://www.molwa.gov.bd/site/page/ab9b255d-84a8-4bf1-9aaa-ac4714c640dc/%E0%A7%AB

বীর নিবাসের ঘরের জন্য আবেদন করলে তা পেতে দীর্ঘ সময় ব্যয় হয়। এক্ষেত্রেও সময়ের কোনো বাধ্যবাধকতা না থাকার কারণে আবেদন করার ছয় বছর অতিবাহিত হয়ে গেলেও কেউ কেউ এখনো ঘর পায় নি বলে অভিযোগ রয়েছে।

১.২ যাচাই-বাছাই প্রক্রিয়ার চ্যালেঞ্জঃ

আবেদন যাচাই-বাছাইয়ের জন্য নির্দিষ্ট কিছু সনদ প্রদর্শন করতে হয়। আবেদন পত্রের সাথে জাতীয় পরিচয়পত্র/স্মার্ট কার্ডের অনুলিপি ও ইউনিয়ন/পৌরসভা/মহানগরের বাসিন্দা হিসেবে সংশ্লিষ্ট চেয়ারম্যান/ওয়ার্ড কাউন্সিলরের প্রত্যয়নপত্র সংযুক্ত করতে হয়। এছাড়া যাচাই-বাছাই প্রক্রিয়ার জন্য মুক্তিযোদ্ধা কমান্ডারদের কাছ থেকে প্রত্যয়নপত্র দাখিল করতে হয়। যাচাই-বাছাই প্রক্রিয়ার জন্য এসব সনদ প্রদর্শন করা অনেক সময়ই প্রক্রিয়াকে আরও জটিল করে। বিশেষকরে জাতীয় পরিচয়পত্র ও মুক্তিযোদ্ধা কমান্ডারের প্রত্যয়নপত্র জোগাড়ের ক্ষেত্রে চ্যালেঞ্জের সম্মুখীন হতে হয়।

অনেকের ক্ষেত্রেই দেখা যায় জাতীয় পরিচয়পত্রে যে বয়স উল্লেখ করা রয়েছে তা অনুমানভিত্তিক। জাতীয় পরিচয় তৈরির সময় সংশ্লিষ্ট তথ্যসংগ্রহকারী কর্মীরা একটি আনুমানিক বয়স লিখে নিয়ে গেছেন যার সাথে প্রকৃত বয়সের ব্যাপক ব্যবধান রয়েছে। অনেক সময় দেখা যায় কারও কারও ক্ষেত্রে আনুমানিক বয়সের হিসেবে মুক্তিযুদ্ধের সময় তার বয়স হয়তো ৪-৫ বছর হয়, কারও কারও ক্ষেত্রে জন্মসালই দেখানো হয়েছে যুদ্ধের সময় বা পরে। যেখানে বীরাঙ্গনা গেজেটভুক্ত করার জন্য যুদ্ধকালীন সময়ে ন্যূনতম বয়স ১২ বছর হতে হবে[৪০] সেখানে জাতীয় পরিচয়পত্রে উল্লিখিত আনুমানিক এই বয়স গেজেটভুক্তির প্রক্রিয়াকে জটিল করে তুলে। এছাড়াও অনেকক্ষেত্রে দেখা যায় আনুমানিক বয়স মূল বয়স হতে দ্বিগুণও দেখানো হয়েছে। ফলে নির্যাতনের সময়ে ঘটনার বর্ণনায় সে যে বয়সের কথা বলছে তার সাথে জাতীয় পরিচয়পত্রের বয়সের মধ্যে বিস্তর ফারাক থাকে। যদিও আইন অনুযায়ী বীরাঙ্গনাদের সংজ্ঞায়নের সাথে এই বিষয়ক একটি নির্দেশনা যুক্ত করা আছে যে, নির্যাতনের ঘটনাটি সম্পূর্ণভাবে প্রমাণ করা গেলে বয়সের বিষয়টি বিবেচ্য হবে না। নির্দেশনাটি হচ্ছে "পাকিস্তানি হানাদার বাহিনী ও তাহাদের সহযোগী কর্তৃক নির্যাতিতা সকল নারী (বীরাঙ্গানা); তবে সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণিত নির্যাতিতা নারী বা বীরাঙ্গনার ক্ষেত্রে সরকার কর্তৃক নির্ধারিত বয়সসীমা প্রযোজ্য হইবে না।"[৪১]

বয়সের বিষয়টি বিশেষ বিবেচনায় দেখা হলেও সেখানে প্রমাণের বিষয়টি গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠে। অনেক সময়ই পারিপার্শ্বিক পরিস্থিতি অনুকূলে না থাকলে বীরাঙ্গনাদের জন্য নিজেদের সাথে হওয়া নির্যাতনের ঘটনার সত্যতা প্রমাণ করা কঠিন হয়ে পড়ে।

কেস-১:

করিমন বেগম (ছদ্মনাম)। যুদ্ধের সময় তার বয়স ছিল ১৫ কি ১৬ বছর। বিয়ে হয়েছে ২ বছর আগে। স্বামী ও শাশুড়ীর সাথে তখন তিনি শ্বশুরবাড়িতেই থাকতেন। একদিন পাকিস্তানিরা তাদের এলাকায় হামলা করে। তখন তাকেসহ তার প্বার্শবর্তী বাড়ির আরও ২ জনকে পাকিস্তানি সৈন্যরা ধর্ষণ করে এবং ক্যাম্পে তুলে নিয়ে যায়। সেখানে তাদের উপর চালানো হয় পাশবিক নির্যাতন। কয়েকদিন পর একজনের সহায়তায় তারা সেখান থেকে পালাতে সক্ষম হয় এবং পরে ভারতের শরণার্থী ক্যাম্পে গিয়ে আশ্রয় নেয়। তার স্বামী সব ঘটনা জানলেও এই বিষয়ে তাকে কখনো কোনো নির্যাতন করেন নি। কিন্তু এলাকার লোকজন ও প্রতিবেশীদের কাছ থেকে তাকে সব সবই নানা কটু কথা শুনতে হয়েছে। জীবনের একটি বীভিষিকাময় অধ্যায় হিসেবে তিনি এই বিষয়টি সব সময় ভুলতে চেয়েছেন। এমনকি স্বেচ্ছাসেবীরা যখন এতো বছর পর জানায় যে সরকার তাদেরকে সম্মান দিচ্ছে তখন তিনি সেটা বিশ্বাস করতে পারেন নি। বারবার তাকে সাহায্যের জন্য এগিয়ে আসা স্বেচ্ছাসেবীদেরকে তাড়িয়ে দিয়েছেন। এরপর যখন আবেদন করতে রাজি হলেন এবং আবেদন করলেন তখন দেখা গেলো ঘটনার বয়সের সাথে তার জাতীয় পরিচয়পত্রে উল্লেখিত বয়স মিলছে না। জাতীয় পরিচয়পত্রে উল্লেখিত বয়স তার বয়স থেকে অনেক কম হয়ে যাওয়ায় ঘটনার সত্যতা প্রমাণ করা তার জন্য কঠিন পড়ে এবং তার আবেদনটি সুপারিশপ্রাপ্ত হয় না। তার সাথে আরও যে ২জন পাকিস্তানি সৈন্যদের দ্বারা ধর্ষণের শিকার হয়েছিল তাদের একজন গেজেটভুক্ত হয়ে গেছে। কিন্তু তথ্যগত ভুলের কারণে তার প্রক্রিয়াটি জটিলতার মুখে পড়েছে। এই প্রসঙ্গে তিনি তার স্বাক্ষাৎকারে বলেছিলেন, *"এমনেই তো দেহি বছরের পর বছর লাগে। আর এহন তো আমার কাগজেই সমস্যা। এটা কি হইবো আল্লা জানে। বাঁইচা থাকতে পামু কিনা জানি না।"*

এছাড়াও কিছু কিছু ক্ষেত্রে মুক্তিযোদ্ধা কমান্ডারদের কাছ থেকে প্রত্যয়নপত্র সংগ্রহ করাটাও কঠিন হয়ে পড়ে। এই বিষয়ে অভিযোগ রয়েছে যে, শুরুর দিকে মুক্তিযোদ্ধা কমান্ডারদের কাছ থেকে প্রত্যয়নপত্র সংগ্রহের ক্ষেত্রে চ্যালেঞ্জের সম্মুখীন হতে হতো। বিশেষকরে বীরাঙ্গনাদেরকে মুক্তিযোদ্ধার সম্মাণনা দেওয়ার বিষয়ে কারও কারও আপত্তি ছিল। ফলে তাদের থেকে বীরাঙ্গনাদের সপক্ষে প্রত্যয়নপত্র সংগ্রহ করা ছিল বেশ কঠিন ও কষ্টসাধ্য কাজ।

[৪০] সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়ের একজন কর্মকর্তার সাক্ষাৎকার।

[৪১] মুক্তিযোদ্ধা কল্যাণ ট্রাস্ট আইন ২০১৮, *প্রাগুক্ত*।

১.৩ আবাসন সুবিধা প্রাপ্তির ক্ষেত্রে চ্যালেঞ্জঃ

অসচ্ছল বীর মুক্তিযোদ্ধাদের জন্য "অসচ্ছল বীর মুক্তিযোদ্ধাদের জন্য আবাসন নিমার্ণ" প্রকল্পের আওতায় আবাসন বরাদ্দের ব্যবস্থা রয়েছে। তবে এক্ষেত্রে আবাসন সুবিধা প্রাপ্তির জন্য সুনির্দিষ্ট পরিমাণ নিজস্ব জমির মালিকানা থাকার বাধ্যবাধকতা রয়েছে। "বীর নিবাস" এর ঘর পাওয়ার জন্য আবেদনকারীর নির্দিষ্ট পরিমাণ জমি থাকা আবশ্যক। আবেদনের শর্ত অনুযায়ী, আবেদনকারীর অবশ্যই দৈর্ঘ্য ৩৯ ফুট × প্রস্থ ২৯ ফুট নিষ্কন্টক জমি নিজ নামে থাকতে হবে।[৪২] অনেকক্ষেত্রেই জমির মালিকানার এই আবশ্যিকতা দরিদ্র ও ভূমিহীন বীরাঙ্গনাদের জন্য একটি চ্যালেঞ্জ। ভূমিহীনদের ক্ষেত্রে খাস জমির বন্দোবস্ত করে সেখানে গৃহ নির্মাণ করে দেওয়ার নির্দেশনা রাখা হলেও খাস জমির বন্দোবস্তও জটিল প্রক্রিয়া যা বেশিরভাগ সময়ই ব্যবস্থা করা সম্ভব হয় না। খাস জমিতে বসবাস করলেও অধিকারস্বত্ত্ব পেয়ে সেখানে "বীর নিবাস" এর ঘর পাওয়া সম্ভব হয়ে উঠে না। এই প্রসঙ্গে একজন বীরাঙ্গনা তার সাক্ষাৎকারে বলেন, "আমার তো জমি নাই নিজের। খাসের জায়গায় থাকি। ঘর তো সরকার এহানে দিবো না। ঘর পাইতে হইলে তো আগে জমি কিনতে হইবো..."।

২. সক্ষমতা ও কার্যকরতা

যেকোন সেবা প্রকৃত ভোক্তা বা ব্যবহারকারীর নিকট পৌঁছে দেওয়ার জন্য সুনির্দিষ্ট ও কার্যকর পরিকল্পনা ও উদ্যোগ এবং একইসাথে পর্যাপ্ত জনবল আবশ্যক। অন্যথায় সদিচ্ছা থাকা সত্ত্বেও কাঙ্ক্ষিত জনগোষ্ঠীর কাছে যথাযথভাবে সেবা পৌঁছে দেওয়া সম্ভব নয়। যথাযথ পরিকল্পনা ও উদ্যোগের ঘাটতি এবং একই সাথে জনবলের ঘাটতির ফলে বীরাঙ্গনারা যথাযথভাবে সেবা পাওয়ার ক্ষেত্রে প্রতিবন্ধকতার সম্মুখীন হচ্ছেন যা বীরাঙ্গনাদের রাষ্ট্রীয় স্বীকৃতি ও অধিকার প্রদানের প্রক্রিয়ায় সংশ্লিষ্ট অংশীজনদের কার্যক্রমের সক্ষমতা ও কার্যকরতার অভাবকেই প্রতিফলিত করে।

২.১ পরিকল্পনা ও উদ্যোগের ক্ষেত্রে ঘাটতি

সরকার বীরাঙ্গনাদের গেজেটভুক্ত করার পদক্ষেপ গ্রহণ করলেও কেন্দ্রীয় বা স্থানীয় পর্যায়ে বীরাঙ্গনাদেরকে খুঁজে বের করা বা চিহ্নিত করার কোনো পরিকল্পনা নেই। সংবেদনশীলতা রক্ষার স্বার্থে বীরাঙ্গনা হিসেবে শুধু যারা স্বেচ্ছায় এগিয়ে আসবেন, গেজেটভুক্ত হওয়ার জন্য তাদেরকেই যাচাই-বাছাই করে এই আওতায় আনার পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছে। সরকারি হিসাব মতে বীরাঙ্গনাদের মোট সংখ্যা ২ লক্ষ। তবে তাদের মধ্যে এখনও কত জন বেঁচে আছেন তার সঠিক হিসাব না থাকলেও ধারণা করা হয় তাঁদের সংখ্যাটা দুই থেকে তিন হাজার, বা কয়েক হাজারের মতো হবে।[৪৩] গেজেটভুক্তির হিসাবে দেখা যায়, এখন পর্যন্ত তালিকাভুক্ত ৪৪৮ জন বীরাঙ্গনার মধ্যে ৪৩৩ জন জীবিত অবস্থায় নিজেদের পক্ষে তালিকাভুক্ত হয়েছেন এবং ১৫ জন বীরাঙ্গনার ক্ষেত্রে তাদের মৃত্যুর পর তাদের পরিবারের সদস্যরা তাদের প্রতিনিধি হয়ে তাদের নাম তালিকাভুক্ত করেছেন।[৪৪]

বীরাঙ্গনাদের খুঁজে বের করা এবং তাদের নির্যাতনের ঘটনাসমূহ লিপিবদ্ধ করার আবশ্যক। একটি স্বাধীন জাতি রাষ্ট্র কিভাবে গড়ে উঠেছিল তার পরিপূর্ণ ইতিহাস জানার জন্য বীরাঙ্গনাদের ইতিহাস জানা আবশ্যক। তাদের পরিপূর্ণ তালিকা প্রণয়ন করা এবং তাদেরকে খুঁজে বের করে তাদের প্রাপ্য সম্মান পাওয়ার পথকে সহজতর করা জরুরি।

"দেশ স্বাধীন হয়েছে বহু বছর হয়ে গেছে। তারা আর কতো অত্যাচার সহ্য করবে। এতো বছর পর তাদেরকে সম্মাননা দেওয়ার ব্যবস্থা করা হয়েছে কিন্তু না জানার কারণে তাদের বেশিরভাগই এই সুবিধা পাচ্ছে না। তাদেরকে তো খুঁজে বের করতে হবে। তারা তো সামনে আসতে চাইবে না তাই বলে কি তাদেরকে জানানোও হবে না। তাদেরকে জানাতে হবে। তারপর সম্মান তারা নিতে চায় কি চায় না তা তাদের ব্যাপার। আগে থেকে তো ধারণা করে রাখা ঠিক না। এখন দেখুন, বেশিরভাগ বীরাঙ্গনারাই অসহায় আশ্রয়হীন। তাদেরকে খুঁজে না বের করলে তারা এসব জানবে কিভাবে। সরকার বলছে তারা নিতে না চাইলে তাদেরকে জোর করা হবে না। কিন্তু ভাই তাদের তো আগে জানাতে হবে, বুঝাতে হবে। আর তাদের খুঁজে বের করার মানে তো তাদের নাম ঠিকানা সব প্রকাশ করে দেওয়া না। এই বিষয়ে যথাযথ পরিকল্পনা দরকার। না হলে শেষ পর্যন্ত বেশিরভাগই হিসাবের বাহিরেই থেকে যাবে।"

-একজন স্বেচ্ছাসেবক

তাছাড়া গেজেটভুক্তির প্রজ্ঞাপন প্রচারে সুনির্দিষ্ট পরিকল্পিত কাঠামো না থাকার কারণে গেজেটভুক্তির জন্য সরকারের এই আহ্বান অনেকক্ষেত্রে প্রকৃত সুবিধাভোগীর কাছে পৌঁছায় না। গেজেটভুক্তির প্রজ্ঞাপন জারি হলে তা বিভিন্ন গণমাধ্যম, যেমন টেলিভিশন, রেডিও, সংবাদপত্রে প্রচার করা হয়ে থাকে। এছাড়া স্থানীয় পর্যায়ে উপজেলা পরিষদ হতে নোটিশ টাঙ্গানো এবং এলাকায় মাইকিং করার মাধ্যমে প্রজ্ঞাপনের সংবাদ প্রচার করা হয়। কিন্তু অনেকক্ষেত্রেই বীরাঙ্গনারা প্রান্তিক পরিসরে বসবাস করার ফলে এবং সরকারি এসব বার্তার বিষয়ে তাদের ধারণা না থাকার কারণে এই আহ্বান অনেক সময়ই তাদের কাছে গিয়ে পৌঁছায় না বা তাঁরা

[৪২] ভূমিহীন ও অস্বচ্ছল মুক্তিযোদ্ধাদের জন্য বাসস্থান নির্মাণ প্রকল্প, *প্রাগুক্ত*।

[৪৩] বিবিসি, 'বীরাঙ্গনাদের সরকারের সম্মানী ভাতা', www.bbc.com/bengali/news/2012/06/120625_sg_birangana (২৫ জানুয়ারি ২০২২)।

[৪৪] বীরাঙ্গনা গেজেট, মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়, *প্রাগুক্ত*।

সেটা বুঝতে পারেন না। এছাড়া দীর্ঘ সময় কোণঠাসা হয়ে থাকা এই মানুষগুলোকে তাদের অধিকারের বিষয়ে বুঝিয়ে তাদেরকে পৃথকভাবে এই সেবার আওতায় আনার জন্য কোনো কর্মসূচি না নিয়ে শুধু গণমাধ্যম ও সাধারণ প্রচারণার মাধ্যমের গেজেটভুক্তির জন্য আহ্বান করা হলে তার সংবাদ তাদের নিকট পৌঁছানো এবং এর মাধ্যমে তাদের সাড়াদানের প্রত্যাশা করা কার্যকর পরিকল্পনা নয়। এই প্রসঙ্গে একজন তথ্যদাতা বলেন, "বীরাঙ্গনারা তো বহুবছরের নিপীড়নের শিকার। ঘর বাড়ি বলে তো কিছুই নেই অনেকের। বেশির ভাগেরই ঠাঁই হয়েছে গোয়াল ঘরে বা বাড়ির কোনো এক কোণায়। অন্যের থেকে চেয়ে চিন্তে খেয়ে বেঁচে আছে তারা। এতো কিছুর খোঁজ খবর কিভাবে জানবে তারা। আবার এমনিতেও কেউ যদি তাদের বলে তাহলেও তো তারা বিশ্বাস করবে না। জীবনে এতো নির্যাতন তারা সহ্য করতে হয়েছে যে কেউ কিছু বললেই তারা এখন আর সহজে বিশ্বাস করে নিতে পারে না। তাদের জন্য কিছু করতে হলে আগে তাদের বিশ্বাস অর্জন করতে হবে। তাদের কাছে আসতে হবে। বুঝাতে হবে।"

তাছাড়া মুক্তিযোদ্ধাদের জন্য বরাদ্দকৃত সেবার তথ্যও পরিকল্পিতভাবে স্থানীয় পর্যায়ে প্রচার না করায় অনেকেই যথাসময়ে তথ্য পান না বলে অভিযোগ রয়েছে।

২.২ জনবলের ঘাটতি

উপজেলা পর্যায়ে বীরাঙ্গনা বা মুক্তিযোদ্ধাদের গেজেটভুক্তির প্রক্রিয়া সামগ্রিকভাবে পরিচালনার জন্য বিশেষভাবে কেউ দায়িত্বপ্রাপ্ত নন। বর্তমানে উপজেলা পর্যায়ে সমাজসেবা কর্মকর্তা তার অন্যান্য নির্ধারিত কাজের সাথে বীরাঙ্গনা বা মুক্তিযোদ্ধাদের গেজেট বিষয়ক কর্মকাণ্ড দেখে থাকেন। কিন্তু এক্ষেত্রে শুধু বীরাঙ্গনা বা মুক্তিযোদ্ধাদের গেজেটভুক্তির জন্য প্রয়োজনী কাজ সম্পাদন করার জন্য নির্দিষ্ট কোনো দায়িত্বপ্রাপ্ত পদ নেই। উপজেলা পর্যায়ের অধিকাংশ বীরাঙ্গনা শিক্ষাগত দিক দিয়ে পিছিয়ে থাকা এবং বয়সের কারণে গেজেটভুক্তির জন্য নির্ধারিত কার্যক্রম সেগুলো যথাযথভাবে সম্পাদন করতে জটিলতার সম্মুখীন হয়ে থাকেন। যেমন, গেজেটভুক্তির আবেদন পত্র পূরণ করা, কোনো কোনো ক্ষেত্রে স্থানীয় জনপ্রতিনিধির প্রত্যয়ন পত্র সংগ্রহের জন্য তার বরাবর আবেদন লেখা, ভাতার জন্য আবেদনপত্র পূরণ করা অথবা কোনো সংশোধনীর জন্য বা আপিলের জন্য আবেদন করার ক্ষেত্রে সহায়তার জন্য প্রশাসনিকভাবে দায়িত্বপ্রাপ্ত কেউ নেই। এছাড়া আবেদনপত্র লেখা বা পূরণ করতে সহায়তা করার জন্য জামুকায় কোনো জনবল নেই। অসহায় অনেক বীরাঙ্গনাকে এসব ক্ষেত্রে সহায়তা করার জন্য পারিবারিকভাবেও তেমন কেউ থাকেন না। অনেকক্ষেত্রেই তখন এসব ক্ষেত্রে সহায়তার জন্য তাদেরকে স্থানীয় স্বেচ্ছাসেবকদের উপর নির্ভর করতে হয়। গেজেটভুক্তি হতে ভাতা ও অন্যান্য সুবিধা প্রাপ্তির জন্য সম্পূর্ণ কাজ স্বেচ্ছাসেবীদেরকে নিজেদের সম্পন্ন করতে হয়।

> **"ঐহানে (উপজেলায়) তো আমাদের কিছু করে দেয় না। খালি বলে দেয় এটা করেন। আমাগো তো লোকজন নাই। এগুলো কেমনে করমু। বুঝিও না তো ওতো কিছু। তাই ঐ ভাইরেই জিগাই। ওতো একা মানুষ। তাও সময় সুযোগ বুইঝা ওই সব কিছু কইরা দেই। খোঁজ খবর দেয়। কি হইছে না হইছে।"**
>
> *- একজন বীরাঙ্গনার সাক্ষাৎকার*

এই প্রসঙ্গে একজন স্বেচ্ছাসেবক জানান, বীরাঙ্গাদের খুঁজে বের করা, তাদের গেজেটভুক্তিতে সহায়তা করা এই সকল কাজই তারা করে থাকেন স্বেচ্ছাপ্রণোদিতভাবে। তারা চান বীরাঙ্গনাদের প্রাপ্য সম্মান ও অধিকার যেন নিশ্চিত হয়। কিন্তু অনেকসময়ই তাদের পক্ষে সকল বিষয় দেখা সম্ভব হয় না।

২.৩ হালনাগাদ ও নির্ভুল তথ্যের ঘাটতি

তথ্যের ব্যবস্থাপনা ও সমন্বয়ের ক্ষেত্রে ঘাটতি লক্ষণীয়। বিশেষকরে হালনাগাদ তথ্য ও তথ্যের নির্ভুলতার ক্ষেত্রে ব্যবস্থাপনা ও সমন্বয়ের ঘাটতি রয়েছে। মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের ওয়েবসাইট এবং মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের এমআইএস-এ তথ্যের মধ্যে ভিন্নতা রয়েছে। মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের এমআইএস এর তথ্য হালনাগাদ নয়। মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের ওয়েবসাইট অনুযায়ী এখন পর্যন্ত গেজেটভুক্ত মোট বীরাঙ্গনা মুক্তিযোদ্ধার সংখ্যা ৪৪৮ জন,[৪৫] অন্যদিকে মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের এমআইএস-এ এন্ট্রি রয়েছে ৪০২ জনের।[৪৬] মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের ওয়েবসাইট এবং মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের এমআইএস গেজেটভুক্ত একই ব্যক্তির নাম এবং পিতা/স্বামীর নামের ক্ষেত্রে ভিন্ন ভিন্ন বানান, পদবি এমনকি ভিন্ন ভিন্ন নামও রয়েছে। মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের ওয়েবসাইটে থাকা ৪৪৮ জন বীরাঙ্গনার তালিকার মধ্যে ৮৯ বীরাঙ্গনার নামের সাথে এমআইএস-এ উল্লেখিত নামের ভিন্নতা রয়েছে। এছাড়া পিতা/স্বামীর নামের ক্ষেত্রে ভিন্ন ভিন্ন বানান, পদবি এমনকি ভিন্ন ভিন্ন নাম রয়েছে ২০৭ জনের। অর্থাৎ ১৯.৮৭% বীরাঙ্গনার নিজ নামের ক্ষেত্রে এবং ৪৬.২১% বীরাঙ্গনার পিতা/স্বামীর নামের ক্ষেত্রে বানান ভুল বা নামের ভিন্নতা রয়েছে।

এছাড়াও গেজেটে অনেকের নাম, ঠিকানায় ভুল রয়েছে। তথ্যের এই ধরনের ভুল থাকার ফলে বীরাঙ্গনাদের নানা ধরনের জটিলতার সম্মুখীন হতে হয়। কোনো কোনো ক্ষেত্রে নির্ধারিত সুবিধা পাওয়ার ক্ষেত্রেও চ্যালঞ্জের সম্মুখীন হতে হয়। বিশেষকরে গেজেটে

---

[৪৫] বীরাঙ্গনা গেজেট, মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়, *প্রাগুক্ত*।

[৪৬] বীরাঙ্গনা গেজেট, মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়, বীর মুক্তিযোদ্ধা তথ্য ব্যবস্থাপনা সিস্টেম, *প্রাগুক্ত*।

ঠিকানা ভুল থাকার কারণে আবাসনের জন্য আবেদন করতে পারছেন না অনেকেই। গেজেটে এই ধরনের ভুল অনেকক্ষেত্রে আবেদন করার সময় প্রদত্ত তথ্যের মধ্যে ভুল থাকার কারণে ফলে তৈরি হয়। এছাড়া পরবর্তী পর্যায়ে তথ্য লিপিবদ্ধকরণের সময় অথবা সংশোধিত তথ্য সকল মাধ্যমে যথাযথভাবে পরিবর্তন না করার ফলে হয়ে থাকে।

চিত্র ২: বীরাঙ্গনাদের নাম ও পিতা/স্বামীর নামের ক্ষেত্রে ভিন্নতা বা ভুলের হার

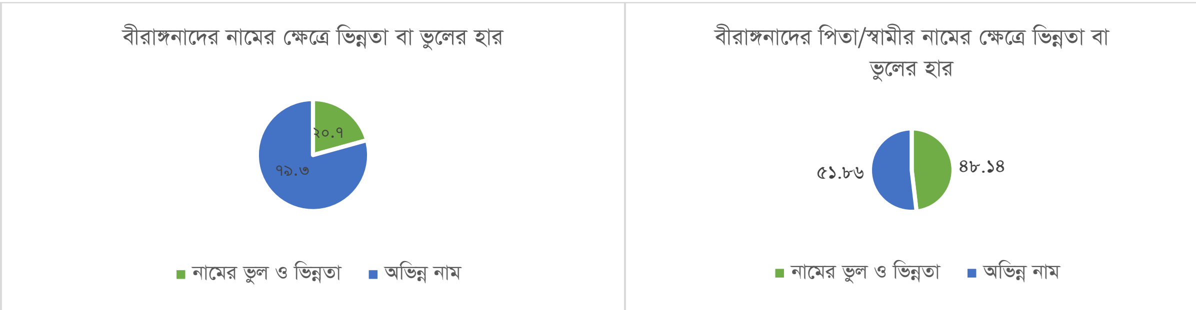

> **"আবেদন করার সময় দেখা গেছে তাদের হয়ে কেউ না কেউ করে দিয়েছে তখন নাম ঠিকানায় ভুল হয়ে গেছে, ঐটাই গেজেটে উঠে গেছে। এখন এগুলো নিয়ে জটিলতা হচ্ছে। উনি ঘরের আবেদন করতে পারছেন না কারণ ঠিকানায় তার বাপের বাড়িরটা দেয়া। এখন এটা পরিবর্তন না করা পর্যন্ত তো আর কিছু করার নাই।"**
>
> *- বীরাঙ্গনাদের নিয়ে কাজ করছে এমন একজন তথ্যদাতার সাক্ষাৎকার*

গেজেটভুক্তির পুরো প্রক্রিয়াটি বেশ কয়েকটি ধাপ অতিক্রম করে সম্পন্ন হয়ে থাকে। এক্ষেত্রে প্রতিটি ধাপে যদি তথ্যের নির্ভুলতা যাচাইয়ের জন্য বিশেষ পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়ে থাকে তাহলে চূড়ান্তভাবে গেজেট প্রকাশের সময় তথ্যের ভুল হওয়ার সম্ভবনা কম থাকে। বিশেষকরে গেজেটভুক্তির প্রতিটি আবেদন উপজেলা পর্যায়ে যাচাই-বাছাই এর জন্য প্রেরিত হয়। তখন প্রতিবেদনে ঘটনার সত্যতা যাচাইয়ের সাথে সাথে নাম, ঠিকানার তথ্য যথাযথভাবে নিরীক্ষণ করে সঠিক তথ্য প্রদান করা হলে এই পর্যায়ে ভুলের মাত্রা অনেকটা কমিয়ে ফেলা সম্ভব। এছাড়া গেজেট প্রকাশ এবং পরবর্তীতে বিভিন্ন জায়গায় নাম, ঠিকানা ও অন্যান্য তথ্য লিপিবদ্ধ করার সময় সতর্কতা অবলম্বন করলেও এই ধরনের ভুল এড়ানো সম্ভব।

তাছাড়া তথ্যের ভুল সংশোধন একটি জটিল প্রক্রিয়া বলে মনে করেন বীরাঙ্গনারা। দীর্ঘ ও জটিল একটি প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে গেজেটভুক্তি হওয়ার কারণে তারা পরবর্তীতে প্রক্রিয়াগত সকল ধরনের জটিলতা এড়িয়ে চলতে চান। এছাড়া তাদের কাছে সঠিক দিক নির্দেশনা না থাকার কারণেও তারা সংশোধন প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে যেতে আগ্রহ প্রকাশ করেন না। তাছাড়া এমআইএস-এ থাকা তথ্যসমূহ হালনাগাদ নয়। এই বিষয়ে সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা জানান, মাঠ পর্যায়ে সুবিধাগ্রহীতারা সহযোগিতামূলক আচরণ না করার কারণে অনেকক্ষেত্রেই তথ্য আপডেট করা সম্ভব হয় না। তিনি বলেন, "উপজেলা পর্যায়ে এমআইএস আপডেট করার জন্য তাদের কাছে বার বার তথ্য চাওয়া হলেও তারা ঠিকমতো দেয় না। অনেকেরই এনআইডি কার্ডে ভুল তথ্য আছে। এটা সংশোধন করা তারা ঝামেলা মনে করে। তাই তথ্যগুলা আপডেট করা যায় না।"

এছাড়া মন্ত্রণালয়ের ওয়েবসাইটে শুধু গেজেটভুক্ত বীরাঙ্গনাদের তথ্য লিপিবদ্ধ রয়েছে। কিন্তু কতজনের আবেদন বর্তমানে মন্ত্রণালয়ের কাছে বিবেচনাধীন রয়েছে এই বিষয়ক কোনো তথ্য দেওয়া নেই। এমনকি এই বিষয়ক কোনো তথ্য জামুকা হতেও প্রকাশ করা হয় নি।

৩. অংশগ্রহণ

বীরাঙ্গনাদের রাষ্ট্রীয় স্বীকৃতি ও অধিকার প্রাপ্তির প্রক্রিয়া বিচ্ছিন্ন কোনো একটি ব্যবস্থা নয়। এর জন্য স্থানীয় পরিসর হতে সরকার পর্যন্ত বিভিন্ন পক্ষের সদিচ্ছা, অংশগ্রহণ ও সমন্বয় আবশ্যক। কিন্তু দেখা যায়, বীরাঙ্গনাদের চিহ্নিত করা বা খুঁজে বের করা, প্রত্যয়ন করা হতে প্রশাসনিক কাজে সহায়তা করা এই বিভিন্ন ধাপসমূহে সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন অংশীজন যেমন, স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠান, স্থানীয় জনগণ এবং অন্যান্য বিভিন্ন পক্ষের অংশগ্রহণ ও সমন্বয় এর ঘাটতির ফলে বিভিন্ন ধরনের চ্যালেঞ্জের সৃষ্টি হয়।

৩.১ বীরাঙ্গনাদের চিহ্নিত করা

মুক্তিযুদ্ধের পর কেন্দ্রীয় বা স্থানীয়ভাবে বীরাঙ্গনাদের কোনো তালিকা সংরক্ষণ করা হয় নি। ১৯৭২ সালে বীরাঙ্গনাদের পুনর্বাসন কেন্দ্রসমূহে আশ্রয় নেওয়া বীরাঙ্গনাদের তালিকা করা হলেও ১৯৭৫ সালের পর পুনর্বাসন কেন্দ্রসমূহ বন্ধ হলে গেলে সেসব তালিকা হারিয়ে যায় বা নষ্ট করে ফেলা হয়। মুক্তিযুদ্ধকালীন প্রজন্মের অনেকেই পর্যায়ক্রমে মৃত্যুবরণ করেছেন। যারা বেঁচে রয়েছেন তারা

জীবনের শেষ প্রান্তে পৌঁছে গেছেন। সামাজিক সাংস্কৃতিক পরিসরে বীরাঙ্গনারা যেখানে বাধ্য হয়েছিল নিজেদের পরিচয় যথাসম্ভব গোপন করে বাকি জীবনটা কাটিয়ে দিতে, সেখানে এই প্রজন্মের সমাপ্তির মধ্য দিয়ে অচিহ্নিত এই বীরাঙ্গনারা চিরতরে হারিয়ে যেতে পারে ইতিহাসের পাতা থেকে।

মুষ্টিমেয় কিছু প্রতিষ্ঠান ও ব্যক্তিবর্গ যখন দেশের স্বার্থে, দেশের স্বাধীনতার জন্য অপূরণীয় আত্মত্যাগী মানুষগুলোর স্বার্থে তাদেরকে খুঁজে বের করার চেষ্টা করছে তখন সবচেয়ে বেশি চ্যালেঞ্জের শিকার হচ্ছে দিক নির্দেশনার অভাবে। সরকারি বা স্থানীয় পর্যায়ে বীরাঙ্গনাদের কোনো তালিকা নেই। এক্ষেত্রে তাদেরকে সহায়তা নিতে হচ্ছে বিভিন্ন ব্যক্তি বা উৎসের। মুক্তিযোদ্ধা, মুক্তিযুদ্ধকালীন সময়ের অন্যান্য ব্যক্তিবর্গ, বীরাঙ্গনাদের নিয়ে কাজ করেছেন এমন ব্যক্তিবর্গের সহায়তা নিয়ে তারা বীরাঙ্গনাদের খুঁজে বের করার চেষ্টা করে যাচ্ছে। তথ্যদাতাদের মতে, বীরাঙ্গনাদের খুঁজে বের করা সবচেয়ে বড় চ্যালেঞ্জ। কারণ প্রথমত, এক্ষেত্রে কোনো তথ্য ও তালিকা নেই যেটি ব্যবহার করে তাদের অবস্থান সম্পর্কে ধারণা পাওয়া যাবে। দ্বিতীয়ত, পরিচিতি গোপন করা। পারিবারিক, সামাজিক-সাংস্কৃতিক চাপে নির্যাতিত এই নারীরা বাধ্য হয়েছিল নিজেদের নির্যাতনের ঘটনাকে গোপন করতে। অনেক ক্ষেত্রেই পরিবার ও সমাজের চাপের মুখে পরিবার পরিজন ছেড়ে অন্যত্র চলে যেতেও বাধ্য হয়েছিল। ফলে স্বাধীনতার এতো বছর পর তাদেরকে খুঁজে বের করা প্রথম ও বড় চ্যালেঞ্জ।

"কাজ করতে গিয়ে আমরা প্রথম যে চ্যালেঞ্জের সম্মুখীন হই তা হচ্ছে খুঁজে বের করা। একটা কথা আমি আপনাকে বলে রাখি, পৃথিবীতে যে নিজে লুকিয়ে থাকে তাকে খুঁজে বের করা কিন্তু সবচেয়ে কঠিন। কিডন্যাপ হোক, হাইজ্যাক হোক বা কেউ লুকিয়ে রাখুক, তাদেরকে খুঁজে বের করা যায়। কিন্তু যে নিজে লুকিয়ে থাকে তাকে কিন্তু খুঁজে বের করা খুবই কঠিন।"

- বীরাঙ্গনাদের নিয়ে কাজ করছে এমন একজন তথ্যদাতার সাক্ষাৎকার

দীর্ঘদিন ধরে আত্মগোপন করে থাকা বা পরিচয় প্রকাশে শঙ্কিত এই মানুষগুলো নিজেদের পরিচয় গোপন করার চেষ্টা করেছে সর্বাত্মকভাবে। তাদের পরিবার-পরিজনও এই বিষয়টি সামনে আসতে দিতে বাধা দিয়েছে ব্যাপকভাবে। নতুন করে আবার অসম্মানিত হওয়ার ভয়ে তারা ভীত ছিল। ফলে বীরাঙ্গনাদের নিয়ে কাজ করেছেন এমন ব্যক্তিবর্গ যখন তাদের খোঁজার চেষ্টা করছিল, তাদের অধিকার নিশ্চিত করার জন্য কাজ করছিলো তখন শুরুতে বীরাঙ্গনাদের পরিবার পরিজন এমনকি খোদ বীরাঙ্গনারাও নানাভাবে তাদেরকে প্রত্যাখ্যান করেছে। এছাড়া স্থানীয় লোকজন বিশেষকরে স্বাধীনতা-বিরোধী হিসেবে চিহ্নিতরাও (রাজাকার হিসেবে পরিচিত) তাদেরকে বাধা দিয়েছে। বীরাঙ্গনাদের পরিচয়ের সাথে সাথে এই স্বাধীনতাবিরোধী হিসেবে চিহ্নিত ব্যক্তিদের অপকর্মের ইতিহাস নতুন করে প্রেক্ষাপটে চলে আসার আশঙ্কায় তার নানাভাবে বীরাঙ্গনাদের খুঁজে বের করতে বাধার সৃষ্টি করেছে।

"আমি তাদের ছেলে-মেয়েদের দ্বারা অপমানিত হয়েছি। আমাকে দা দিয়ে তাড়ানো হয়েছে যে আমি কেন যাই? আমাদেরকে রাজাকাররা তাড়িয়েছে যে আমরা কেন তাদের বাড়িতে যাই? এখন কথা হচ্ছে, যে যে জায়গাগুলোতে পাকিদের ক্যাম্প হয়েছিল তার কয়েক মাইলের মধ্যে মেসিভ আকারে নির্যাতন হয়েছিল। এটা শুধু কিন্তু প্রমাণের বিষয় না, বিবেচনাবোধেরও বিষয়। ওরা যেখানে ক্যাম্প করেছিল সেখানে নারীদের ধরে এনে ধর্ষণ করে নাই, আটকে রাখে নাই এটা বিশ্বাসযোগ্য না। যখন যেখানে গেছে সেখানে তো হাতের কাছে যাকে পেয়েছে তাকে নির্যাতন করেছেই, সেগুলো বিচ্ছিন্ন ঘটনা। তবে ক্যাম্পের আশেপাশে সামষ্টিকভাবে এই ঘটনাগুলো ঘটেছে। আর তাদের সাহায্য করেছে কারা, খোঁজ দিয়েছে কারা, সেটা তো কারওরই অজানা না। এখন তারা তো বাধা দিবেই, বীরাঙ্গনার পরিচয় প্রকাশ পেলে তো তারাদের কীর্তিও নতুন করে আবার ফাঁস হবে। এখন শুধু এখানে ৮ থেকে ৮০ বছরের প্রায় ১৫ জন ধর্ষিত হয়েছিল। স্বীকার করে মাত্র ৩ জন। বাকিরা সামনে আসে নাই, আসতে চায় নাই, আসতে দেয় নাই।"

- বীরাঙ্গনাদের নিয়ে কাজ করছে এমন একজন তথ্যদাতার সাক্ষাৎকার

৩.২ প্রত্যয়ন করার ক্ষেত্রে অসহযোগিতা

বীরাঙ্গনাদেরকে গেজেটভুক্তির প্রক্রিয়ায় ঘটনার সত্যতা প্রমাণের জন্য বেশ কিছু প্রত্যয়নের প্রয়োজন হয়। এক্ষেত্রে তাদেরকে স্থানীয় মুক্তিযোদ্ধা কমান্ডার বা মুক্তিযোদ্ধাদের নিকট হতে প্রত্যয়ন সংগ্রহ করতে হয়। ঐ সময়ে বর্তমান ছিলেন, অর্থাৎ ঘটনার প্রত্যক্ষদর্শী এমন ৩ জনের ঘটনার সত্যতার সপক্ষে স্বাক্ষ্য প্রদান করতে হয়, এবং স্থানীয় জনপ্রতিনিধির নিকট হতে প্রত্যয়ন সংগ্রহ করতে হয়। এক্ষেত্রে দেখা যায়, শুরুর দিকে স্থানীয় পর্যায়ে কিছু কিছু ক্ষেত্রে প্রত্যয়ন করতে মুক্তিযোদ্ধাদের একাংশ অসহযোগিতামূলক আচরণ করেছেন। বীরাঙ্গনাদেরকে প্রত্যয়ন করার ক্ষেত্রে তাদের মনোভাব ইতিবাচক ছিল না। বিশেষকরে বীরাঙ্গনাদের মুক্তিযোদ্ধা খেতাব দেওয়ায় বিষয়ে তাদের অনেকের বেশ আপত্তি ছিল। অস্ত্র হাতে যুদ্ধ করার কৃতিত্বের সাথে তারা বীরাঙ্গনাদের আত্মত্যাগের জন্য দেওয়া সম্মাননাকে সব পর্যায়ে বিবেচনা করতে নারাজ ছিলেন। তবে সকলক্ষেত্রে যে একই রকম ঘটনা ঘটেছে তা নয়। অনেকক্ষেত্রেই মুক্তিযোদ্ধারা নিজেরাই বীরাঙ্গনাদের খুঁজে বের করতে, তাদের প্রত্যয়ন করার ক্ষেত্রে প্রত্যক্ষভাবে সহায়তা করেছেন।

"এটা সত্য যে শুরুর দিকে মুক্তিযোদ্ধাদের দিক হতে অনেক অসহযোগিতামূলক আচরণ এসেছে। তারা বীরাঙ্গনাদের মুক্তিযোদ্ধা খেতাব দেওয়া নিয়েও নারাজ ছিলেন। অনেকে তো বলেছেন, তাদেরকে জানিয়ে কেন আবেদন করা হলো না। এই রকম

অনেক কিছু। গালিগালাজ করে তাড়িয়ে দিয়েছে। তবে সব সময় সব জায়গা যে এমনই হয়েছে তা না। অনেক মুক্তিযোদ্ধাকে আমি দেখেছি তারা বীরাঙ্গনাদের অধিকারের জন্য নিজেরা কাজ করেছে। তারা নিজেরা ফোন করে আমাদেরকে বীরাঙ্গনাদের নাম ঠিকানা দিয়েছে। তাদের সাহায্য করার জন্য অনুরোধ করেছে। খারাপ ভালো সব জায়গায়ই ছিল। এক্ষেত্রেও ছিল।"

- বীরাঙ্গনাদের নিয়ে কাজ করছে এমন একজন তথ্যদাতার সাক্ষাৎকার

এছাড়া প্রত্যয়নের ক্ষেত্রে স্থানীয় জনগোষ্ঠী বা প্রতিবেশীরাও অসহযোগিতামূলক আচরণ করে। অনেকক্ষেত্রেই বীরাঙ্গনাদের প্রতি নেতিবাচক মনোভাব বা ব্যক্তিগতভাবে দ্বান্দ্বিক সম্পর্কের জের ধরেও অনেকে বীরাঙ্গনাদের পক্ষে সাক্ষী দেওয়ার ক্ষেত্রে অসহযোগিতা করে। কিছুক্ষেত্রে কেউ কেউ গিয়ে বীরাঙ্গনাদের বিপক্ষেও স্বাক্ষী দিয়েছে। বীরাঙ্গনার দাবি করা নির্যাতনের ঘটনা মিথ্যা বলে তারা কর্তৃপক্ষের নিকট অভিযোগও করেছে। ক্ষেত্রবিশেষে স্থানীয় জনপ্রতিনিধির দিক থেকে সহযোগিতামূলক আচরণের ঘাটতি লক্ষ করা গেছে। মুক্তিযুদ্ধের পরে জন্মগ্রহণ করা এবং বীরাঙ্গনাদের নিয়ে সামাজিক পরিসরে বিদ্যমান নেতিবাচক মনোভাবের কারণে কিছু কিছু ক্ষেত্রে স্থানীয় জনপ্রতিনিধিদের নিকট হতে প্রত্যাশিত সহায়তা পাওয়া যায় নি। বীরাঙ্গনাদের নিয়ে কাজ করছে এমন একজন তথ্যদাতা বলেন, "আমরা বীরাঙ্গনা "ক"[৪৭]-কে খুঁজে বের করেছিলাম। তাকে তারা এলাকা থেকে বিচার করে, পঞ্চায়েত ডেকে বিচার করে তারপরে বের করে দেয়। বের করে দেয় এই হিসেবে, নষ্টা মেয়ে মানুষ বলে বের করে দেয়। কিন্তু তার যে ত্যাগটা সেটা কিন্তু সবাই জানে। সে একাই পুরো গ্রামটাকে পাকিস্তানি মিলিটারিদের হাত থেকে বাঁচিয়েছিল। যাদের সে বাঁচিয়েছিল সে গ্রামবাসীই স্বাধীনতার পরে তাকে বিচার করে গ্রাম থেকে বের করে দেয়। বের করে দেওয়ার পরে সে নিরুদ্দেশ হয়ে যায়। পরবর্তীতে উনাকে খুঁজে বের করা হয়। এটা একটা দীর্ঘ ইতিহাস। তাকে তখন কিন্তু কেউ গ্রহণ করে নি। তাকে নিয়ে আমরা বিভিন্ন জায়গায় যাই। সামাজিকভাবে কেউ তাকে গ্রহণ করে নি। তার হয়ে কথা বলে নি।"

"আমাদের দেশে বীরাঙ্গনাদের নিয়ে মনোভাব ভাল না। যে মুক্তিযোদ্ধা কমান্ডার চিহ্নিত করবেন তিনি প্রকৃত কমান্ডার কিনা সেটা সন্দেহের বিষয়। নিজেকে মুক্তিযোদ্ধা বলে দাবি করা এই কমান্ডারদের অনেকের বয়স দেখলে বোঝা কঠিন যে তারা যুদ্ধের সময় কিভাবে যুদ্ধ করেছে। একজন কমান্ডার একবার একজন বীরাঙ্গনার প্রসঙ্গে বলছিলেন, 'ও তো ভাল মেয়েমানুষ না ...'। আমি তখন বলতে বাধ্য হয়েছিলাম যে, 'আপনি তো এভাবে বলতে পারেন না। কোনো পরিস্থিতিতে তার সাথে এই অবস্থা হয়েছিল সেটা তো আপনি আগে দেখবেন। সে নিজে ইচ্ছে করে তো কিছু করেন নি'। এভাবে বলার পর সে কিছুটা দমেছিলো।"

- বীরাঙ্গনাদের নিয়ে কাজ করছে এমন একজন তথ্যদাতার সাক্ষাৎকার

৩.৩ যোগাযোগের ক্ষেত্রে ঘাটতি

বীরাঙ্গনাদের সাথে স্থানীয় প্রশাসনিক কর্মকর্তাদের যোগাযোগের ক্ষেত্রে কিছুটা ঘাটতি রয়েছে। যেহেতু বীরাঙ্গনাদের গেজেটভুক্তি ও সুবিধাপ্রাপ্তির সম্পূর্ণ প্রক্রিয়াতে সার্বিকভাবে সরাসরি সহায়তার জন্য প্রশাসনিকভাবে কেউ দায়িত্বপ্রাপ্ত নন এবং সম্পূর্ণ প্রক্রিয়াটিই কমবেশি স্থানীয়ভাবে স্বেচ্ছাসেবক ব্যক্তিবর্গের সহায়তায় হয়ে থাকে, ফলে স্থানীয় প্রশাসনিক কর্মকর্তাদের সাথে বীরাঙ্গনাদের নিয়মিত যোগাযোগ তৈরি হয়ে উঠে না। এছাড়া নারী ও বয়স্ক হওয়ার কারণেও বেশিরভাগ ক্ষেত্রে তারা প্রশাসনিক পরিসরে খুব বেশি যাতায়াত করতে পারেন না। ফলে তাদের জন্য কোনো সেবা বা সুবিধা বরাদ্দ হলে অনেকসময়ই তারা তা জানতে পারেন না। বেশিরভাগ সময়ই স্বেচ্ছাসেবীদের মাধ্যমে তাদেরকে এই সংবাদগুলো জানতে হয়। এছাড়াও কোনো সেবার জন্য কোনো আবেদন করা হলে তার আপডেট সম্পর্কে জানার জন্যও বীরাঙ্গনাদের স্বেচ্ছাসেবীদের সহায়তা নিতে হয়। এই প্রসঙ্গে একজন বীরাঙ্গনা বলেন, "উপজেলায় কহন কি আসে জানিও না ঠিক মতো, পাই ও না। মহিলা মানুষ বুঝেনই তো। বয়সও তো হইছে। একা চলবার পারি না। মুক্তিযোদ্ধারা যায় সব সময়, হেরাই পায়।" আরেকজন তথ্যদাতা বলেন, "কবে ঘরের জন্য দরখাস্ত করছি। কিছু তো জানায় না। খোঁজ খবর নিতে গেলে হুনি ঘর দেওয়া শেষ। কিভাবে কি করার তাও তো বুঝি না। তাই হেরেই ফোন দিতে হয়...কি হইলো, কি করমু একটু দেহেন...।"

এই প্রসঙ্গে বীরাঙ্গনাদের নিয়ে কাজ করছে এমন একজন তথ্যদাতা জানান, উপজেলা পর্যায়ে বীরাঙ্গনাদের যাতায়াত কম। তাদেরকে সহায়তা করার মতোও তেমন কেউ নেই। ফলে অনেকক্ষেত্রে এখনো তাদেরকেই বীরাঙ্গনাদেরকে সহায়তা করতে হয়। সব সময় সম্ভব না হলেও তারা চেষ্টা করে বীরাঙ্গনাদেরকে যথাসাধ্য সহায়তা করার জন্য।

৪. অনিয়ম ও দুর্নীতি

[৪৭] গোপনীয়তা রক্ষার স্বার্থে ছদ্মনাম ব্যবহার করা হয়েছে এবং শনাক্তযোগ্য সকল তথ্য ব্যবহার হতে বিরত থাকা হয়েছে।

বীরাঙ্গনাদের গেজেটভুক্তির আবেদন হতে শুরু করে সুবিধাপ্রাপ্তির বিভিন্ন পর্যায়ে নানভাবে অনিয়ম ও দুর্নীতির শিকার হওয়ার অভিযোগ রয়েছে। তবে দুর্নীতি হলেও জটিলতা এড়ানোর জন্য এই বিষয়ে অভিযোগ করা এড়িয়ে চলেন বীরাঙ্গনারা। প্রশাসনিক পর্যায়েও দুর্নীতি প্রতিরোধমূলক জোরদার কোনো ব্যবস্থা না থাকার ফলে এসব অনিয়ম ও দুর্নীতিসমূহ রয়ে যাচ্ছে বিভিন্ন পরিসরে।

৪.১ গেজেটভুক্তির প্রক্রিয়ায় অনিয়ম ও দুর্নীতি:

গেজেটভুক্তির বিভিন্ন ধাপে অনিয়ম ও দুর্নীতির শিকার হতে হয় বীরাঙ্গনাদের। তথ্যদাতাদের মতে, কমবেশি সকল আবেদনকারী বীরাঙ্গনাই নানা পক্ষ হতে বিশেষকরে স্থানীয় পর্যায়ে অনিয়ম ও দুর্নীতির শিকার। তবে কাজ শেষ করার জন্য এবং পরবর্তী জটিলতা এড়ানোর জন্য তারা এই প্রসঙ্গে কথা বলেন না। কিছু কিছু ক্ষেত্রে প্রত্যয়নের সময় নিয়ম-বহির্ভূতভাবে টাকা আদায়ের অভিযোগ রয়েছে। প্রত্যয়ন সংগ্রহ করার জন্য প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে বীরাঙ্গনাদের হতে টাকা আদায় করা হয়ে থাকে। অনেকসময় স্বেচ্ছাসেবীরা সরাসরি যুক্ত থাকায় সরাসরি টাকা আদায় না করতে পারলেও পরবর্তীতে বীরাঙ্গনাদের কাছ থেকে টাকা আদায় করা হয়। এছাড়া কাগজপত্রের কোনো জটিলতা থাকলেও সেক্ষেত্রে বীরাঙ্গনাদের কাছ থেকে এসব কাগজপত্র ঠিক করার খরচ বাবদ অর্থ আদায়ের কথাও শোনা যায়। তবে এক্ষেত্রে প্রশাসনিক পর্যায়ে নয় বরং, স্থানীয় প্রভাবশালী দলের লোকজন এই ধরনের দাবি করে থাকেন বলে অভিযোগ রয়েছে। এছাড়া প্রশাসনিক পর্যায়ে কোনো আবেদন জমা দেওয়ার সময় পিয়ন বা সহকারীদের চা-নাস্তা খাওয়ার টাকা দেওয়ার এক ধরনের অলিখিত নিয়ম রয়েছে। পিয়ন বা সহকারী না চাইলেও নিজ থেকেই তাদেরকে কিছু দিয়ে আসার প্রবণতা রয়েছে। সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের কাছে সঠিক সময়ে আবেদনটি পেশ করা হবে না বা ফেলে রাখা হবে এই আশংকা হতে তাদেরকে খুশি রাখার জন্য তাদের হাতে কিছু টাকা দিয়ে আসা হয়। এই প্রসঙ্গে একজন তথ্যদাতা বলেন, "কাজ করাতে হলে তো কিছু টাকা পয়সা দিতেই হয়, এটা তো হয়ই ... এটা নিয়ে আর কি বলবো ...।"

আরেকজন বীরাঙ্গনা জানান, কাগজপত্রের কিছু জটিলতার কারণে তার আবেদন দীর্ঘ দিন যাবত স্থগিত হয়ে আছে। তার মতো আরও একজন বীরাঙ্গনারও একই অবস্থা। এসব নিয়ে দৌড়াদৌড়ি করার মতো তাদের কেউ নেই। তাই প্রক্রিয়াটি দীর্ঘ হচ্ছে। এলাকার একজন তাদের হয়ে কাজ করার জন্য তাদেরকে প্রস্তাব দিয়েছেন। যদি তারা দুইজন মিলে তাকে ৫০ হাজার ৫০ হাজার করে এক লক্ষ টাকা দেন তাহলে তিনি তাদের হয়ে এই কাজ করে দিবেন। এভাবে সাহায্য করার বিনিময়েও বীরাঙ্গনাদের কাছে অনেকে টাকা দাবি করেন বলে অভিযোগ রয়েছে।

গেজেটভুক্তির এই পুরো প্রক্রিয়াটি জটিল হওয়ার কারণে এবং প্রশাসন হতে সরাসরি সহায়তা করার ব্যবস্থা না থাকার কারণে বীরাঙ্গনাদেরকে অনেকক্ষেত্রেই অনিয়ম ও দুর্নীতি শিকার হতে হয়।

৪.২ বীর নিবাসের ঘর পাওয়ার ক্ষেত্রে অনিয়ম ও দুর্নীতির শিকার:

আবাসন সুবিধা নিশ্চিত করার জন্য কোনো কোনো পক্ষ থেকে অবৈধভাবে অর্থ দাবি করা হয়। কয়েকটি জায়গায় মুক্তিযোদ্ধা সংসদের সদস্যের বিরুদ্ধে এই অভিযোগ রয়েছে। বীর নিবাসের ঘর পেতে হলে তাদেরকে নির্দিষ্ট একটি অংকের টাকা দিতে হবে নতুনা ঘর পাবে না এমন হুমকি দিয়ে টাকা দাবি করার অভিযোগ রয়েছে। সরাসরি বীরাঙ্গনাদের অথবা তাদের পরিবারের সদস্যদের কাছে এই টাকা দাবি করা হয়ে থাকে। আরেকজন তথ্যদাতা বলেন, "টাকা তো চায়ই। এক লাখ চায় আরকি। দেহা হইলেই কয় টাকা না ছাড়লে ঘর কিন্তু হইবো না। লোকজন দিয়াও কওয়ায়।"

> **"হেরা তো কয় ঘর পাইতে হইলে তো টাকা পয়সা কিছু খরচ করতে হইবো। সরকার তোমারে এতো লাখ ট্যাকার ঘর দিবো, তোমারেও তো কিছু দিতে হইবো... লাখ খানেক টাকা চায়... তা না হইলে ঘরের নাকি ব্যবস্থা হইবো না।"**
>
> *- একজন বীরাঙ্গনার সাক্ষাৎকার*

এছাড়া আবাসনের আবেদনে অস্বচ্ছল মুক্তিযোদ্ধাদের অগ্রাধিকার না দেওয়ার অভিযোগ রয়েছে। আবাসনের প্রজ্ঞাপনে অস্বচ্ছল বীরাঙ্গাদেরকে অগ্রাধিকারের ভিত্তিতে ঘর দেওয়ার কথা বলা হলেও তারা ঘর পাওয়া থেকে বঞ্চিত হচ্ছে। আবেদন করার ৬ বছর অতিক্রান্ত হয়ে গেলেও কেউ কেউ এখনো ঘর পায় নি বলে অভিযোগ রয়েছে।

৪.৩ বীরাঙ্গনা নন এমন ব্যক্তিদের গেজেটভুক্ত হওয়া

কিছু কিছু ক্ষেত্রে বীরাঙ্গনা নন এমন ব্যক্তিদের গেজেটভুক্ত হয়ে যাওয়ার অভিযোগ রয়েছে। মিথ্যা সাক্ষ্য প্রমাণ ও দলিলের ভিত্তিতে বীরাঙ্গনা নন এমন ব্যক্তিরা গেজেটভুক্ত হয়ে থাকতে পারে বলে মনে করে প্রশাসন। দীর্ঘ সময়ের ব্যবধান এবং সার্বিকভাবে তথ্য প্রমাণাদি নিয়ে আসলে প্রশাসনের পক্ষে তা ধরতে পারা সম্ভব না হওয়ার ফলে কিছু বানোয়াট ব্যক্তিগণ গেজেটভুক্ত হয়ে যাচ্ছে বলে মনে করা হয়।

> **"বিতর্কিত ব্যক্তিদেরও গেজেটভুক্ত হয়ে যাওয়ার বিষয়টি এখন শোনা যায় পত্রপত্রিকায়। আসলে যেভাবে সুন্দরভাবে কাগজপত্র, সাক্ষী নিয়ে আসে তখন কমিটির না রাজি হওয়ার কোনো উপায় থাকে না। এখন আমরা তো এই মুক্তিযুদ্ধের**

প্রজন্মেরও না। আমাদের এখন বিশ্বাসের উপরই করতে হবে, আর ডকুমেন্টের উপরই করতে হবে ... এখন ৩ জন সাক্ষী নিয়ে আসে, তারা যদি সাক্ষী দেয় ... এক্ষেত্রে কিছুই হয়তো করার ছিল না।"

- সংশ্লিষ্ট সরকারি কর্মকর্তার সাক্ষাৎকার

বীরাঙ্গনাদের নিয়ে কাজ করছেন এমন তথ্যদাতারা মনে করেন, বানোয়াট ব্যক্তিদের বীরাঙ্গনা হিসেবে গেজেটভুক্তির যে প্রবণতা তা মূলত সুপরিকল্পিত। ভাতার পরিমাণ ও অন্যান্য সুযোগসুবিধা প্রাপ্তি এই সকল কিছুকে বিবেচনায় রেখে একদল স্বার্থান্বেষী মিথ্যা পরিচয় দিয়ে গেজেটভুক্ত হওয়ার চেষ্টা করছে। তারা মনে করেন, এক্ষেত্রে প্রশাসনকে আরও সচেতন হতে হবে। শুধুমাত্র প্রভাবশালী ব্যক্তিবর্গের মতামতকে গুরুত্ব না দিয়ে, সাক্ষ্য প্রমাণকে আরও ভালোভাবে যাচাই-বাছাই করতে হবে। অন্যান্য বিভিন্ন পক্ষের মতামত যাচাই করতে হবে। এই প্রসঙ্গে একটি ঘটনা বর্ণনা করতে গিয়ে একজন তথ্যদাতা বলেন, "উপজেলার এক মিটিংয়ে একজনকে বীরাঙ্গনা বলে নিয়ে আসছে। এলাকার প্রভাবশালী লোক উনি। এখন আমরা তো এই এলাকায়ই বড়ো হয়েছি। যারে নিয়ে আসছে তাকেও ভালভাবে চিনি। আজ পর্যন্ত এমন কোনো কথাও শুনি নাই। আর যুদ্ধের সময় তার বয়স ৩-৪ বছরের বেশি থাকার কথাই না। উনি যখন বললেন যে, উনার জন্য আবেদন করা হবে তখন সব শুনে আমরা পয়েন্টগুলো ধরলাম। তখন তো উনি আর কথা বলতে পারেন না। তখন তিনি কথা ঘুরানোর জন্য বললেন, উনি নাকি যাচাই করতে চাইছিলেন যে, বীরাঙ্গনারা ঠিক মতো গেজেটভুক্ত হচ্ছেন কিনা! এই হলো আমাদের অবস্থা!"

তিনি আরও বলেন, "কিছুদিন আগে একজনকে বীরাঙ্গনা গেজেটভুক্ত করা হয়। তাকে নিয়ে আমাদেরকে ঘোর আপত্তি ছিল। কিন্তু আমরা আটকাতে পারি না। মিথ্যা স্বাক্ষী প্রমাণ দিয়ে হয়ে গেলো। স্বাক্ষী এমনভাবে সাজিয়ে নিয়ে আসে যেনো ঘটনার সময় সে ঐখানেই ছিল। এক্ষেত্রে প্রশাসনকে আরও সচেতন হওয়া দরকার। মিথ্যা সাক্ষী তো গরগর করে সব বলে ফেলে। আর সত্যিরা তো বলতেই পারে না। বার বার নাকজ হয়ে ফিরে আসে। যার সাথে এমন ঘটনা ঘটে সে কিভাবে ওতো সহজে এই কথাগুলো সবার সামনে বলবে!"

৫. জবাবদিহিতা

বীরাঙ্গনাদের গেজেটভুক্তি ও সুযোগসুবিধা প্রাপ্তির প্রক্রিয়ায় বিভিন্ন অনিয়ম ও দুর্নীতির অভিযোগ রয়েছে। এসব নিয়ন্ত্রণ ও তদারকির জন্য প্রশাসনের তেমন কোনো ব্যবস্থা নেই। অভিযোগ গৃহীত হলে তা নিরসনের ব্যবস্থা থাকলেও অনিয়ম ও দুর্নীতি শনাক্তকরণ বা চিহ্নিতকরণের ক্ষেত্রে ঘাটতি রয়েছে।

৫.১ অনিয়ম ও দুর্নীতি নিয়ন্ত্রণ ও তদারকি ব্যবস্থার ঘাটতি

বীরাঙ্গনা ও তাদের প্রতিনিধিরা গেজেটভুক্তির বিভিন্ন ধাপে এবং আবাসন সুবিধা পাওয়ার ক্ষেত্রে অনিয়মের শিকার হলেও পরবর্তী জটিলতা এড়ানোর জন্য দুর্নীতির অভিযোগ করা থেকে বিরত থাকে। গেজেটভুক্তির সামগ্রিক প্রক্রিয়াটি বেশ জটিল ও সময় সাপেক্ষ। ফলে প্রক্রিয়াগত কোনো নতুন জটিলতা যাতে আর সৃষ্টি না হয় বা আরও বেশি সময়ক্ষেপণ যাতে না হয় এর জন্য তারা কোনো প্রকার অভিযোগ জানানো থেকে বিরত থাকেন। এমনকি স্বেচ্ছাসেবী যারা তাদের জন্য কাজ করেন তাদের কাছেও বেশিভাগ সময় এই বিষয়গুলো জানান না।

"বীরাঙ্গনাদের তালিকাভুক্তির এই পুরো প্রক্রিয়াটাই জটিল ও সময়সাপেক্ষ। অনেককেই কোনো না কোনোভাবে টাকা পয়সা দিতে হয়। তারা দেয়। কিন্তু এটা নিয়ে তারা কথা বলে না। এমনেই নানান জটিলতা আছে। এরপর এটা নিয়ে নতুন করে আর কোনো ঝামেলা হোক সেটা চায় না। অনেকে ভয় পায়, এতে না আবার শেষে বাতিল হয়ে যায়। যে যতটা পারে দেয়।"

- একজন স্বেচ্ছাসেবীর সাক্ষাৎকার

অনিয়ম ও দুর্নীতি নিয়ন্ত্রণ ও তদারকির জন্য প্রশাসনের নির্দিষ্ট কোনো ব্যবস্থা নেই। তারা জানান যদি এমন ধরনের কোনো অভিযোগ পাওয়া যায় তাহলে তাৎক্ষণিকভাবে তার বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়া হবে। মিথ্যা পরিচয়ধারী কোনো ব্যক্তির ক্ষেত্রে তার গেজেট বাতিল এবং অন্য কোনো ধরনের অনিয়মের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য যথাযোগ্য শাস্তির ব্যবস্থা নেওয়া হবে। এই প্রসঙ্গে সংশ্লিষ্ট একজন কর্মকর্তা বলেন, "এমন কোনো অভিযোগের কথা শুনি নাই। এখন পর্যন্ত কেউ আমাদের কাছে কোনো অভিযোগ করে নি। তবে অভিযোগ করলে আমরা অবশ্যই ব্যবস্থা নিবো।"

৬. সংবেদনশীলতা

বীরাঙ্গনাদের রাষ্ট্রীয় স্বীকৃতি ও অধিকার প্রাপ্তির প্রক্রিয়ায় সবচেয়ে বড় যে চ্যালেঞ্জ তা হচ্ছে সংবেদনশীলতার চ্যালেঞ্জ। সমাজ-সাংস্কৃতিক পরিসর, রাষ্ট্রীয় স্বীকৃতি ও অধিকার প্রদানের সামগ্রিক প্রক্রিয়া, সংশ্লিষ্ট অংশীজন ও বিভিন্ন পক্ষের সংবেদনশীলতার ঘাটতি বীরাঙ্গনাদের রাষ্ট্রীয় স্বীকৃতি ও অধিকার আদায়ের প্রক্রিয়াকে জটিল করে তুলেছে।

৬.১ সংশ্লিষ্ট অংশীজনের মধ্যে সংবেদনশীলতার ঘাটতি

সামাজিক-সাংস্কৃতিক পরিসরে বীরাঙ্গনাদের প্রতি নেতিবাচক মনোভাব বিদ্যমান। বীরাঙ্গনাদেরকে সমাজ একভাবে কোণঠাসা করে দিয়েছে। মুক্তিযুদ্ধে নির্যাতনের শিকার হওয়া এইসব নারীদেরকে পরিবার ও সমাজ থেকে সহজভাবে গ্রহণ করা হয় নি। অনেককে পরিবারের আশ্রয় হারাতে হয়েছে, স্বামী সংসার হতে বহিঃস্কৃত হতে হয়েছে। যারা পরিবারের কাছে আশ্রয় পেয়েছে তারা প্রায় সকলেই বিষয়টি গোপন রাখার চেষ্টা করেছে। এই প্রসঙ্গে একজন তথ্যদাতা বলেন, "প্রতিবেশী বা আশেপাশের লোকজন এই বিষয়টি সম্মানজনক চোখে দেখে না। যারা নির্যাতিত তাদেরকে তারা মনে করতো নষ্টা মেয়ে। একটা ভিখিরি বা পাগলেরও যে মর্যাদা তাদের সে মর্যাদা ছিল না। তারা তাদেরকে অচ্ছুত মনে করতো ...।"

এই পরিস্থিতিতে বীরাঙ্গনাদের রাষ্ট্রীয় অধিকার প্রদানের জন্য তাদের প্রেক্ষাপটে নিয়ে আসা অন্যতম একটি চ্যালেঞ্জ। বহু বছরের নির্যাতন ও লাঞ্ছনার শিকার হওয়া এই মানুষগুলো নতুন করে আবার অপদস্থ হওয়ার ভয়ে সামনে আসতে নারাজ ছিল। এতো বছর ধরে আড়াল করে রাখা এই পরিচয় তারা সামনে আনতে দ্বিধাগ্রস্ত ছিল। তাদের পরিবার-পরিজন নিজেদের সম্মানের ভয়ে বীরাঙ্গনাদের সামনে আসতে বাধার সৃষ্টি করেছে। বীরাঙ্গনা হিসেবে স্বীকৃতি নেওয়ার জন্য আবেদন করতে রাজি হওয়ায় তাদের পরিবার পরিজনদের দ্বারা নতুনভাবে নির্যাতনের শিকার হতে হয়েছে। কোনো কোনো ক্ষেত্রে পরিবার ও সমাজের চাপে গেজেটভুক্তির আবেদন জমা দেওয়ার পরও তা তুলে ফেলতে বাধ্য করা হয়েছে। পরিবারের সদস্যদের দ্বারা ঘর ছাড়তে বাধ্য হয়েছেন। এমনকি মৃত্যুর পরও সন্তানরা মায়ের দাফনে-শরিক হতে আসে নি।

"উনার দুই ছেলের ঘোর আপত্তি ছিল এতে। মায়ের গায়ে হাতও তুলেছে তারা। শেষে বাড়ি থেকে বের করে দিয়েছে। মার এই বীরাঙ্গনা পরিচয় তারা নিতে চায় নি। এমন কি তার মৃত্যুর পর জানাযাতেও আসে নি। কিন্তু মজার ব্যাপার হলো এখন ঐ বীরাঙ্গনা মায়ের ভাতার টাকার ভাগ নিতে কিন্তু বাধে না। আবার ঘরও চাই তাদের!"

-বীরাঙ্গনাদের নিয়ে কাজ করছে এমন একজন তথ্যদাতার সাক্ষাৎকার

তবে সবক্ষেত্রে যে পরিবারের সদস্যরা বাধার সৃষ্টি করেছে তা নয়। কিছু কিছু ক্ষেত্রে পরিবারের সদস্যরা, কারও কারও ক্ষেত্রে স্বামী, কারও কারও ক্ষেত্রে ছেলে-মেয়ে এক্ষেত্রে বীরাঙ্গনাদেরকে তাদের অধিকারের জন্য সামনে আসার জন্য তাদের পাশে থেকে সার্বিক সহায়তাও করেছে। এক্ষেত্রে বীরাঙ্গনার সাথে সাথে তাদের পরিবার পরিজনদেরকেও সমাজের মানুষের নানা কটু কথা সহ্য করতে হয়েছে।

কেস-২:

সালমা বেগম। যুদ্ধের কিছুদিন আগে তার বিয়ে হয়। যুদ্ধের সময় তিনি শ্বশুরবাড়িতেই ছিলেন। পাকিস্তানি সেনারা যেদিন তাদের বাড়িতে হামলা করে ঐদিন বাড়ির সবাই পালিয়ে যেতে সক্ষম হলেও তিনি পাকিস্তানি সেনাদের হাতে ধরা পড়ে যান এবং নির্যাতনের শিকার হন। ঐ ঘটনার পর যুদ্ধের পুরো সময়টা তিনি শ্বশুরবাড়িতেই ছিলেন। তারাও তাকে নিয়ে তখন কিছু বলে নাই। যুদ্ধের বছর দুয়েক পর তার একটি ছেলেও হয়। কিন্তু ধীরে ধীরে তার শ্বশুর বাড়ির লোকজন, প্রতিবেশীরা তাকে নানাভাবে কথা শুনাতে শুরু করে। কোনো বিষয়ে ঝগড়া হলেই ঐ ঘটনার কথা বলে তাকে হেনস্থা করে। তার স্বামী সব শুনলেও কিছু বলেন না। এমনকি তিনিও কারণে অকারণে তাকে নানা ধরনের অপমানজনক কথা বলেন ঐ ঘটনাকে ঘিরে। এভাবে একটা সময় পর তিনি বাধ্য হন শ্বশুর বাড়ি ছেড়ে চলে আসতে। আসার সময় তাকে তার ছেলেকে আনতে দেওয়া হয় নি এই কথা বলে যে, তার সাথে থাকলে ছেলে তার মতই চরিত্রহীন হবে। এমনকি তার সাথে পরে তার ছেলে দেখাও করতে দেওয়া হতো না। এরপর তার অন্যত্র বিয়ে হয়, তার আগের শ্বশুর বাড়ির পাড়াতেই। তারা সবটা জেনেই তাকে ঘরে তুলে এনেছিল। সেখানে তার একটি ছেলে হয়। দরিদ্রতার সাথে লড়াই করে তিনি তার এই ছেলেকে মানুষ করেন। তার স্বামী অসুস্থ হওয়ার কারণে কোনো কাজ করতে পারেন না। তার আগের ছেলে একই পাড়ায় থাকার পরও তার সাথে দেখা করে না, কথাও বলে না। যুদ্ধের এতো বছর পরও তাকে এখনো ঐ ঘটনার জন্য হেনস্থার শিকার হতে হয়। তার বর্তমান এই সংসারে তার ছেলে তাকে সব সময় সমর্থন করে। গেজেটভুক্তির জন্য সেই তার মাকে বুঝিয়েছে। তার অধিকারের জন্য সে তার সাথে লড়ছে। এর জন্য তার ছেলেও মানুষের কাছ থেকে না কটূক্তি সহ্য করতে হয়।

৬.২ স্বীকৃতি প্রাপ্তির প্রক্রিয়ায় সংবেদনশীলতার ঘাটতি

গেজেটভুক্তির প্রক্রিয়ায় অন্যতম জটিলতা হচ্ছে যাচাই-বাছাই কমিটির সামনে আবেদকারী বীরাঙ্গনাকে **১৯৭১** সালে তার সাথে হওয়া নির্যাতনের ঘটনা বর্ণনা করা, যা কোনোভাবেই সংবেদনশীল নয়। নির্যাতনের এই ঘটনা যা এতো বছর ধরে তারা ভুলে যাওয়ার চেষ্টা করছে তা নতুন করে আবার নিজ মুখে বর্ণনা করা তাদের জন্য কষ্টকর। এছাড়া ৩-৪ জন অপরিচিত মানুষের সামনে

বসে এ ধরনের স্পর্শকাতর একটি বিষয় নিয়ে কথা বলাটাও তাদের জন্য কঠিন। ফলে ঘটনার বর্ণনা করার ক্ষেত্রে বীরাঙ্গনাদের মধ্যে জড়তা লক্ষ করা যায়। অনেক সময়ই তারা কমিটির সামনে কোনো কথা বলেন না বা আংশিকভাবে বলেন যার সাথে লিখিত ঘটনার সামঞ্জস্য থাকে না। ফলে তাদের আবেদন খারিজ বা দ্বিধাবিভক্ত হয়ে যায়। আর এভাবে প্রক্রিয়াটি দীর্ঘ হতে থাকে।

"তাদের সাথে হওয়া নির্যাতনের ঘটনা একদিনে জানি নি। গেলাম আর বলে দিলো তা না। তাদের কাছে বার বার যেতে হয়েছে, বিশ্বাস অর্জন করতে হয়েছে। তারপর যখন তাদের মনে হয়েছে তখন বলেছে। এখন ৩-৪ জন মিলে বসে বললাম বলেন তো ঘটনা, সেভাবে তো হবে না। যারা ঐখানে বসে আছে সব উনার মেয়ের বয়সী বা নাতি-নাতনীর। তাদের সাথে এই বিষয় নিয়ে ফুট করে তো কথা বলে ফেলবে না। কত দিনের চেষ্টায় আমরা তাদের থেকে কথা শুনি। একা তার ঘরে বসে শুনি, সেখানে কি এভাবে কেউ কথা বলবে নাকি বলা উচিত। এর জন্যই তারা সেখানে কথা বলতে পারে না। আবেদন খারিজ হয়। আবার আবেদন করতে হয়।"

-বীরাঙ্গনাদের নিয়ে কাজ করছে এমন একজন তথ্যদাতার সাক্ষাৎকার

এছাড়াও বীরাঙ্গনাদের বেশিরভাগই বয়স্ক। দীর্ঘদিন অভাব অনটনের মধ্যে থেকে, রোগে ভুগে, নানা নির্যাতন সহ্য করে অনেকেই মানসিকভাবে পরিপূর্ণ সুস্থ নন। ফলে বার্ধক্যজনিত কারণে বা মানসিক স্থিরতার অভাবে পুরনো অনেক স্মৃতি তারা ভুলে গেছেন, বা সাময়িক সময়ের জন্য ভুলে যাচ্ছেন। এমন পরিস্থিতিতেও তাদের পক্ষে কমিটির সামনে ধারাবাহিকভাবে পুরো ঘটনা বর্ণনা করা সম্ভব হয় না।

এছাড়া বীরাঙ্গনাদের স্বীকৃতি প্রদানের এই প্রক্রিয়ায় সামাজিক-সাংস্কৃতিক প্রেক্ষাপটের কারণে সৃষ্ট নেতিবাচক মনোভাব থেকে বীরাঙ্গনা, তাদের পরিবার-পরিজন সর্বোপরি সাধারণ মানুষদের সচেতন করার জন্য কোনো পদক্ষেপ নেই। সংশ্লিষ্ট সকলের নিকট এই বিষয়টি স্পষ্ট যে বীরাঙ্গনাদের স্বীকৃতি প্রদানের এই প্রক্রিয়াটি সংবেদনশীল। সংবেদনশীলতা রক্ষার স্বার্থে প্রশাসনিকভাবে যে পদক্ষেপটি নেওয়া হয়েছে তা হলো যারা স্বেচ্ছায় তালিকাভুক্তির জন্য এগিয়ে আসবে কেবল তাদেরকেই তালিকাভুক্ত করে সুযোগ-সুবিধা প্রদান করা হবে,[৪৮] যা পক্ষান্তরে বীরাঙ্গনাদের সাথে যুক্ত যে নেতিবাচক মনোভাব সেই বিষয়টিকেই টিকিয়ে রাখতে সমর্থন করে।

৬.৩ স্বীকৃতি প্রাপ্তি ও সুযোগ-সুবিধার সমস্যা

স্বীকৃতি প্রাপ্তির পরও বীরাঙ্গনাদের পরিবার ও সমাজের হেনস্থার শিকার হতে হয়। বীরাঙ্গনাদের জন্য সরকারের সম্মানী ভাতাকে স্থানীয় পর্যায়ে ব্যঙ্গ করে "পাঞ্জাবিদের ভাতা" হিসেবে ব্যবহার করে বীরাঙ্গনাদেরকে অপদস্থ করা হয়। তাদের সাথে কেউ দেখা করতে গেলেও তাদেরকে ঘিরে নানা অপমানজনক কথা সহ্য করতে হয় তাদেরকে।

"এহনো কথা শুনতে হয় মা। এই যে কেউ আইলেই হেরা কইবো ঐ যে হের বাপ মায়েরা আইছিলো। পাঞ্জাবিগো ট্যাহা দিতে। পাঞ্জাবিরা তো গেছে গা। এহন হেরা হের ট্যাহা দিতাছে। পোলা মাইয়াগো সামনেই যা তা কয়।"

- একজন বীরাঙ্গনার সাক্ষাৎকার

অনেকক্ষেত্রে দীর্ঘদিন হতে আড়াল করে রাখা নির্যাতনের এই ঘটনা স্বীকৃতির সাথে সাথে প্রকাশ পাওয়ায় বীরাঙ্গনাদের মধ্যে এক ধরনের জড়তা ও দ্বিধা কাজ করে। স্বীকৃতি গ্রহণের মধ্য দিয়ে পুরনো ঘায়ের কথা আবার সামনে চলে আসা এবং সকলের সামনে বিষয়টি প্রকাশ পেয়ে যাওয়ায় তাদের মধ্যে নতুন এক ধরনের ভয় ও শঙ্কা কাজ করে। এই প্রসঙ্গে একজন বীরাঙ্গনা বলেন, "এতো দিন তো কাউরে কিছু বলি নাই। হে (বীরাঙ্গনার স্বামী) জানতো ঠিকই, কিন্তু হেও কোনো দিন কিছু জিগায় নায় আমারে, আমিও কই নাই। এহন তো সবাই-ই জাইন্না গেলো।"

অনেকে এক্ষেত্রে নিজেদের স্বীকৃতি ও ভাতা প্রাপ্তির বিষয়টি এড়ানোর জন্য বিভিন্ন কৌশল ব্যবহার করেন। ভাতার টাকাটি তিনি নিজের স্বামীর অথবা বাবার মুক্তিযোদ্ধা হওয়ার সুবাদে পাচ্ছেন বলে সন্তানদেরকে বলে। বেশির ভাগই এই বিষয়ে সন্তানদের সাথে কথা এড়িয়ে চলতে চান। সকলেই হয়তো বিষয়টি জানেন, কিন্তু দ্বিধাবোধের কারণে এই বিষয়ে কথা এড়িয়ে চলেন। একজন বীরাঙ্গনা বলেন, "এতো বছরেও আমি আমার বাপের বাড়ির কাউরে কিছু কই নাই। মারেও কইতে পারি নাই। ঐ ঘটনার পর কয়েক বছর বাপের বাড়িতেই ছিলাম। কিন্তু কেউ কিছু জানে না।" আরেকজন বলেন, "মাইয়ারা জানে এটা ওগো বাপের টাকা। হে যুদ্ধ করছিলো হেই টাকা আমারে দিতাছে। এটাই কই। হেরাও আমারে কিছু আর জিগায় না।"

ভাতার টাকা নিয়েও বীরাঙ্গনাদেরকে নানা সমস্যার শিকার হতে হয়। ছেলে মেয়েরা ভাতার টাকা ভাগাভাগী নিয়ে চাপ প্রয়োগ করে। ভাতার সম্পূর্ণ টাকা ছেলেমেয়েরা কে কতটুকু অংশ নিবে, কাকে কি দিতে হবে এই নিয়ে চাপ প্রয়োগ করে। এমনকি মেয়ের জামাইও মেয়েকে চাপ প্রয়োগ করে ভাতার টাকার অংশ দেওয়ার জন্য নাহলে মেয়েকে তালাক দিয়ে দেওয়ার হুমকি দেয়। এই

[৪৮] *প্রাগুক্ত।*

প্রসঙ্গে একজন তথ্যদাতা বলেন, "মেয়ের জামাই বলে তালাক দিয়ে দিবে। এখনি টাকা দিতে হবে। তোর মাকে বল টাকা দিতে। পাঞ্জাবিদের ভাড়া তো খাইতাছে।"

প্রাপ্ত ভাতার অধিকাংশ টাকাই বীরাঙ্গনাদের ব্যয় করতে হয় ছেলে-মেয়েদের চাহিদা পূরণের পিছনে। অনেকক্ষেত্রে সম্পূর্ণ টাকাটাই ছেলে-মেয়েরা ভাগ করে নিয়ে যায়। এছাড়া ভাতার টাকার বিপরীতে ব্যাংকের ঋণ তুলেও ছেলে-মেয়েদের চাহিদা পূরণ করতে বাধ্য হতে হয়।

চতুর্থ অধ্যায়: উপসংহার

সার্বিক পর্যবেক্ষণ

'বীরাঙ্গনা' প্রত্যয়টি আমাদের স্বাধীনতার সাথে ঘনিষ্ঠভাবে জড়িয়ে রয়েছে। তাঁদের আত্মত্যাগ আমাদের স্বাধীনতার ইতিহাসের একটি অনন্য অংশ। কিন্তু স্বাধীন বাংলাদেশে দীর্ঘ চার দশকের বা তারও বেশি সময় তারা ছিল প্রায় অদৃশ্য। মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস পাঠে পরিমিত পর্যায়ে বীরাঙ্গনাদের উপর ঘটে যাওয়া নির্যাতনের একটি চিত্র পাওয়া গেলেও ব্যক্তি বীরাঙ্গনারা যেন অদৃশ্য হয়ে গিয়েছিল সমাজ হতে। পরিবার, সমাজ এবং সর্বোপরি রাষ্ট্রের কলঙ্কিত অধ্যায় হিসেবে বিবেচনা করে বীরাঙ্গনাদের অস্তিত্বই মুছে ফেলা হয়েছিল সমাজ থেকে। নীলিমা ইব্রাহিম তার "আমি বীরাঙ্গনা বলছি" শীর্ষক গ্রন্থে দেখিয়েছিলেন, বীরাঙ্গনা উপাধির শ্রেষ্ঠত্বের উজ্জ্বলতা ম্লান হয়ে গিয়েছিল সমাজের কুণ্ঠাবোধের দ্বারা।[৪৯] দীর্ঘ ৪ দশক পর ১৯৭১ সালে ধর্ষণের শিকার নারীদের রাষ্ট্রীয় সম্মাননা প্রদান হারিয়ে যাওয়া একটি অধ্যায় এবং একদল মানুষকে সামনে নিয়ে আসার সুযোগ করে দিয়েছে যাদের প্রতি বাংলাদেশ জাতিরাষ্ট্র সর্বাগ্রে ঋণী ও কৃতজ্ঞ। মুক্তিযুদ্ধের চার দশক পরে হলেও মুক্তিযোদ্ধা হিসেবে বীরাঙ্গনাদের রাষ্ট্রীয় স্বীকৃতি ও সুযোগ-সুবিধা প্রদান সরকারের একটি অনন্য পদক্ষেপ।

তবে বীরাঙ্গনাদের চিহ্নিত করা থেকে শুরু করে রাষ্ট্রীয় স্বীকৃতি ও সুযোগ-সুবিধা প্রদানের পুরো প্রক্রিয়ায় নানা ঘাটতি বিদ্যমান। বীরাঙ্গনাদের রাষ্ট্রীয় স্বীকৃতি ও অধিকার প্রাপ্তির প্রক্রিয়া যেখানে সর্বোচ্চ গুরুত্বের সাথে বাস্তবায়ন করা আবশ্যক সেখানে পরিকল্পনাহীনতা, প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতার ঘাটতি, কাঠামোগত জটিলতা, অনিয়ম-দুর্নীতির সুযোগ, জবাবদিহি ব্যবস্থা ও সংবেদনশীলতায় ঘাটতি প্রক্রিয়াটিকে করে তুলেছে জটিল। তার সাথে সামাজিক সচেতনতা ও সংবেদনশীলতার ঘাটতিও লক্ষণীয়। স্বাধীনতার এতো বছর পরও বীরাঙ্গনাদের প্রতি সামাজিক মনোভাব এখনো সংকীর্ণ। স্থানীয় পর্যায়ে সামাজিক-সাংস্কৃতিক নেতিবাচক মনোভাবের কারণে বীরাঙ্গনারা এখনো প্রান্তিকীকরণের শিকার। বীরাঙ্গনাদের রাষ্ট্রীয় স্বীকৃতি ও অধিকার প্রদানের এই প্রক্রিয়াটি গতানুগতিক অন্যান্য প্রক্রিয়া হতে ভিন্ন। কিন্তু বীরাঙ্গনাদের রাষ্ট্রীয় স্বীকৃতি ও সুযোগ-সুবিধা প্রাপ্তির পুরো প্রক্রিয়াটি গতানুগতিক আমলাতান্ত্রিক পদ্ধতিনির্ভর। সংবেদনশীল এই বিষয়টি বিশেষ বিবেচনায় না রাখার কারণে সম্পূর্ণ প্রক্রিয়াটি বীরাঙ্গনাদের জন্য অনেকক্ষেত্রেই জটিলতার সৃষ্টি করছে।

গবেষণার সুপারিশ

বীরাঙ্গনাদের রাষ্ট্রীয় স্বীকৃতি ও অধিকার প্রাপ্তির প্রক্রিয়ায় বিদ্যমান সুশাসনের চ্যালেঞ্জ থেকে উত্তরণের জন্য এই গবেষণার ফলাফলের আলোকে নিম্নোক্ত সুপারিশসমূহ উপস্থাপন করা হলো।

১. বীরাঙ্গনাদের খুঁজে বের করার জন্য নির্দিষ্ট কাঠামো ঠিক করতে হবে। উপজেলা পর্যায়ে মুক্তিযুদ্ধের প্রত্যক্ষদর্শী ও তরুণ প্রজন্মের নাগরিকদের নিয়ে কমিটি গড়ে তোলা যেতে পারে যেখানে মুক্তিযুদ্ধের প্রত্যক্ষদর্শীদের সহায়তা নিয়ে তরুণ প্রজন্ম স্থানীয় পর্যায়ে বীরাঙ্গনাদের খুঁজে বের করবে এবং তালিকাভুক্ত করতে সার্বিক সহায়তা করবে।

২. স্থানীয়/উপজেলা পর্যায়ে গেজেটভুক্তির আবেদন প্রক্রিয়া হতে সকল সুযোগ-সুবিধা প্রাপ্তির প্রক্রিয়ায় সার্বিকভাবে সহায়তা করার জন্য মুক্তিযুদ্ধ মন্ত্রণালয় হতে নির্দিষ্ট ব্যক্তিকে দায়িত্ব প্রদান করতে হবে। গেজেটভুক্তি ও অন্যান্য সুবিধা প্রাপ্তির তথ্য স্থানীয়/উপজেলা পর্যায়ে নির্দিষ্ট দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তির মাধ্যমে সুবিধাভোগীর কাছে পৌঁছাতে হবে।

৩. গেজেটভুক্তি হতে শুরু করে ভাতা ও অন্যান্য সুযোগ-সুবিধা প্রাপ্তির প্রক্রিয়া আবেদন করার পর সর্বোচ্চ কত দিনের মধ্যে সম্পন্ন করতে হবে সে বিষয়ে নির্দিষ্ট নির্দেশনা থাকতে হবে এবং নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে সম্পূর্ণ প্রক্রিয়া সম্পন্ন করতে হবে।

৪. সার্বিক তথ্য প্রমাণাদি যাচাই-বাছাই করে আবেদনের সত্যতা পাওয়া গেলে বীরাঙ্গনাদের সাক্ষাৎকারের বিষয়টি বাদ দিতে হবে।

৫. গেজেটে তথ্যের নির্ভুলতা নিশ্চিত করতে হবে এবং তথ্যগত জটিলতা এড়ানো জন্য, বিশেষকরে জাতীয় পরিচয়পত্রে বয়স সংক্রান্ত ভুল সংশোধনের ক্ষেত্রে দ্রুত ও বিশেষ পদক্ষেপ নিতে হবে।

[৪৯] নীলিমা ইব্রাহিম, *আমি বীরাঙ্গনা বলছি*, জাগ্রতি প্রকাশনী, ১৯৯৮।

৬. বীরাঙ্গনাদের আবাসন সুবিধা পাওয়ার জন্য নির্দিষ্ট পরিমাণ জমির বিষয়টি বাতিল করতে হবে এবং অস্বচ্ছল ও ভূমিহীন বীরাঙ্গনাদের অগ্রাধিকারের ভিত্তিতে আবাসন বরাদ্দ করতে হবে।
৭. সমাজে বীরাঙ্গনাদের সম্মানজনক অবস্থানের জন্য তাদের অবদানকে পাঠ্যপুস্তকে অন্তর্ভুক্ত করতে হবে। মুক্তিযুদ্ধ ও নারী বিষয়ক বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে/কাজে বীরাঙ্গনা বিষয়ক কার্যক্রমসমূহ আরও গুরুত্বের সাথে বিবেচনা করতে হবে এবং গণমাধ্যমে বীরাঙ্গনাদের অবদান গুরুত্বের সাথে তুলে ধরতে হবে।
৮. স্বাধীনতা ও বিজয় দিবসকেন্দ্রিক বিভিন্ন সরকারি অনুষ্ঠানে বীরাঙ্গনাদের সম্পৃক্ত করতে হবে।
৯. বীরাঙ্গনাদের সামাজিক স্বীকৃতির জন্য সচেতনতামূলক পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে যাতে বীরাঙ্গনারা নিজেদের প্রাপ্য সম্মান গ্রহণের জন্য এগিয়ে আসতে উদ্বুদ্ধ হন।
১০. বীরাঙ্গনাদের তালিকাভুক্তি হতে শুরু করে বিভিন্ন সুবিধা প্রাপ্তির ক্ষেত্রে কার্যকর জবাবদিহি কাঠামো তৈরি করতে হবে এবং অনিয়ম ও দুর্নীতির বিষয়ে প্রশাসনকে বিশেষভাবে নজরদারি করতে হবে।

সংযুক্তি-১: উপস্থাপনার শিরোনাম স্লাইডে ব্যবহৃত চিত্র প্রসঙ্গে

গবেষণা ফলাফলের জন্য তৈরি উপস্থাপনার শিরোনাম স্লাইডের পটভূমিতে একটি চিত্র জলছাপ আকারে ব্যবহার করা হয়েছে। চিত্রটি মূলত লন্ডনস্থ একটি থিয়েটার ও আর্ট কোম্পানি “কমলা কালেকশন” এর বীরাঙ্গনা বিষয়ক একটি একক নাট্যের প্রমোশনাল পোস্টার। সিরাজগঞ্জের বীরাঙ্গনা নারীদের আত্মকাহিনীর উপর ভিত্তি করে ২০১৪ সালে “Birangona: Women of war” নামক এই নাটকটি নির্মিত হয়। ২০১৪ সালের মার্চ মাসে ঢাকার মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরে নাটকটি প্রথম মঞ্চস্থ হয়। [৫০]

[৫০] কমলা কালেকশন এর ওয়েবসাইট, বিস্তারিত দেখুন: www.komola.co.uk/birangona